

সূরা ৪ : নিসা মাদানী

سُورَةُ النَّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত : ১৭৬, রুকু : ২৪)

(آيَاتُهَا : ১৭৬. رُكُوعَاتُهَا : ২৪)

সূরা নিসার গুরুত্ব

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রাঃ) যায়িদ ইব্ন সাবিতও (রাঃ) এটাই বলেন। মুসতাদরিক হাকিমে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ‘সূরা নিসার মধ্যে পাঁচটি এমন আয়াত আছে যে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেয়ে যেতাম তথাপি আমি তত খুশি হতাম না যত খুশি এ আয়াতগুলিতে হয়েছি। একটি আয়াত হচ্ছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা। (সূরা নিসা, ৪ : ৪০) দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩১) তৃতীয় আয়াত হচ্ছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৮) চতুর্থ আয়াত হচ্ছে :

‘ঐ লোকগুলো যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আসতো এবং নিজেও স্বীয় পাপের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেত।’

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত। (সূরা নিসা, ৪ : ৬৪) পঞ্চম আয়াতটি হচ্ছে :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

এবং যে কেহ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১১০) (হাকিম ২/৩০৫)

ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আপনারা আমাকে সূরা নিসা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। কারণ আমি যখন মাত্র যুবক তখনই কুরআন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছি। ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, যদিও তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩০১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<p>১। হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে যাঞ্চা কর, এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী।</p>	<p>۱. يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا</p>

তাকওয়া অবলম্বন এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়াদ্র হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে এবং অন্তরে যেন তাঁরই ভয় রাখে। অতঃপর তিনি স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন :

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এবং ঐ ব্যক্তি হতেই তিনি হাওয়াকেও (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। আদম (আঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাম পাজরের পিছন দিক হতে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। তিনি জাগ্রত হয়ে তাঁকে দেখতে পান এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রতিও হাওয়ার (আঃ) ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে : ‘মহিলাকে পাজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে উঁচু পাজর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বক্র। সুতরাং তুমি যদি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করার ইচ্ছা কর তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা ঐভাবে থাকতে দাও তাহলে অবশ্যই উপকার লাভ করতে পারবে।’ (ফাতহুল বারী ৬/৪১৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হাওয়া (আঃ) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করে দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের প্রকারে, গুণে, রংয়ে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। তিনি যেমন তাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন, ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নিবেন এবং একটি মাঠে জমা করবেন।

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

তা‘আলাকে ভয় করতে থাক, তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত করতে থাক। তোমরা সেই আল্লাহরই মাধ্যম দিয়ে, তাঁরই নামের দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট যাপ্ণ করে থাক।’ যেমন কেহ বলে, ‘আমি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং আত্মীয়তাকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাকে এ কথা বলছি।’ (তাবারী ৭/৫১৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা তাঁরই নামে শপথ করে

থাক এবং অঙ্গীকার দৃঢ় করে থাক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন : তোমরা আল্লাহকে ভয় করে আত্মীয়তার রক্ষণাবেক্ষণ কর, ওর বন্ধন ছিন্ন করনা, বরং যুক্ত রাখ। একে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার কর ও সম্মান কর। (তাবারী ৭/৫২১-৫২৩) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত অবস্থা ও কার্যাবলীর সংবাদ রাখেন এবং তিনি খুব ভালভাবে তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী রয়েছেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ৬) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, অথবা তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।’ (ফাতহুল বারী ১/১৪০) ভাবার্থ এই যে, তোমরা তাঁর প্রতি মনোযোগ দাও যিনি তোমাদের উঠা, বসা, ও চলা-ফেরায় তোমাদের রক্ষক হিসাবে রয়েছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ‘হে মানবমণ্ডলী! একই বাপ-মায়ের মাধ্যমে তো তোমাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং তোমরা পরস্পরে একে অপরের প্রতি প্রেম-প্রীতি বজায় রেখ, দুর্বলদের সহায়তা কর এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে রয়েছে যে, ‘মুযা’র গোত্রের লোকেরা যখন নিজেদেরকে চাদরে আবৃত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে, কেননা তাদের শরীরে কাপড় পর্যন্ত ছিলনা, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাতের পর দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন, যাতে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, ৫৯ : ১৮) অতঃপর তিনি জনগণকে দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি তার দীনার থেকে, তার দিরহাম থেকে, তার গম থেকে, তার খেজুর থেকে সাদাকাহ প্রদান করলেন এবং অন্যান্যরা যে যা পারলেন ঐ লোকগুলোকে দান করলেন। স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, খেজুর, গম ইত্যাদি সব কিছুই দিলেন ...। (মুসলিম ২/৭০৫, আহমাদ ৪/৩৫৮, নাসাঈ ৫/৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/৭৪)

২। আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন সম্পত্তি বুঝিয়ে দাও এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করনা ও তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।

۲. وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

৩। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুটি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে করে নাও; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাদের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে পারবেনা তাহলে মাত্র একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); এটা আরও উত্তম; এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।

۳. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

৪। আর নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর, কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিন্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে সঠিক বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।

۴. وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

ইয়াতীমদের সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে

وَلَا تَبَدَّلُوا ۝

আল্লাহ তা‘আলা পিতৃহীনদের অভিভাবকগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন, **وَلَا تَبَدَّلُوا** এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করা। পিতৃহীনেরা যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে ও বিবেকসম্পন্ন হয় তখন তাদেরকে তাদের সম্পদ পূরাপুরি প্রদান করবে। কিছুমাত্র কম করবেনা বা আত্মসাৎও করবেনা। তাদের সম্পদকে তোমাদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করার বাসনা অন্তরে পোষণ করা। তোমাদের হালাল সম্পদ ছেড়ে দিয়ে অপরের সম্পদ যা তোমাদের জন্য হারাম তা কখনও গ্রহণ করা। নিজেদের দুর্বল ও শীর্ণ পশুগুলো দিয়ে অপরের মোটা-তাজাগুলো হস্তগত করা। মন্দ দিয়ে ভাল নেয়ার চেষ্টা করা। পূর্বে লোকেরা এরূপ করত যে, তারা পিতৃহীনদের ছাগলের পাল হতে বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে নিজেদের দুর্বল ছাগলগুলো দিত এবং এভাবে গণনা ঠিক রাখত। মন্দ দিরহামগুলো তাদের সম্পদের সাথে রেখে দিয়ে তাদের ভালগুলি নিয়ে নিত। (তাবারী ৭/৫২৬) তারা পিতৃহীনদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের মধ্যে মিশ্রিত করে এ কৌশল করত যে, এখন আর স্বাতন্ত্র্য কি আছে? তাই আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা বলেন, ‘তাদের সম্পদের সাথে তোমাদের সম্পদ মিশ্রিত করা, কেননা এটা বড় পাপ।’ মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন শীরীন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আবু সিনানও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৭/৫২৮)

মোহর ছাড়া ইয়াতীমাকে বিয়ে করা নিষেধ

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ۝

কোন পিতৃহীনা বালিকার লালন পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তোমরা তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা কর, কিন্তু যেহেতু তার অন্য কেহ নেই, কাজেই তোমরা এরূপ করা যে, তাকে মোহর কম দিয়ে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করবে, বরং আরও বহু মহিলা রয়েছে তাদের মধ্যে তোমাদের পছন্দমত দু’টি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে কর।

আয়িশা (রাঃ) বলেন : ‘একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল। তার ধন-সম্পদও ছিল এবং বাগানও ছিল। যে লোকটি তাকে লালন পালন করছিল সে শুধুমাত্র তার ধন-সম্পদের লালসায় পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে করে এবং ঐ ইয়াতীম মেয়েটির সম্পদ সে তার সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে এবং তার অংশ থেকে (খরচ বাবদ) নিজের অংশে নিয়ে নেয়। তখন **وَإِنْ خِفْتُمْ**

أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৮৭)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, উরওয়া ইবন যুবাইর (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ‘হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীনা বালিকার বর্ণনা, যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার সম্পদে তার অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার সম্পদ ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্য জায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেত ততটা সে দেয়না। সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে, সে যেন ঐ বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য মহিলাদেরকে পছন্দ মত বিয়ে করে নেয়।’ অতঃপর জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ ব্যাপারেই প্রশ্ন করে এবং এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। **وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ** (৪ : ১২৭)

এখানে বলা হয়েছে যে, যখন পিতৃহীনা মেয়ের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম থাকে তখন তো অভিভাবক তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনা, সুতরাং এটা সঙ্গত নয় যে, তার সম্পদও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পূর্ণ হক আদায় না করেই তাকে বিয়ে করবে। তবে হ্যাঁ, ন্যায়ের সাথে যদি পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ করে বিয়ে করে তাহলে কোন দোষ নেই। (ফাতহুল বারী ৮/৮৭)

চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ

দুনিয়ায় স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই। তাদের মধ্য হতে যেন পছন্দ মত কেহকে বিয়ে করে। ইচ্ছা করলে দু’টি, তিনটি অথবা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। অন্য জায়গায়ও এ শব্দগুলি এ অর্থেই এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে :

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُزْغَ

যিনি বাণীবাহক করেন মালাইকাকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখা বিশিষ্ট। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১) মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে এর চেয়ে বেশি ডানা বিশিষ্ট মালিকও রয়েছে। কেননা এটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু

পুরুষের জন্য এক সাথে চারটির বেশি স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ, যেমন এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অধিকাংশ বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুতরাং চারটির বেশীর উপর সমর্থন থাকলেও অবশ্যই তা বলতেন।

গাইলান ইব্ন সালমাহ সাকাফী (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন : 'তোমার ইচ্ছা মত চারটি স্ত্রী রেখে অন্যদের পরিত্যাগ কর।' তিনি তাই করেন। উমারের (রাঃ) খিলাফতের যুগে তিনি তার ঐ স্ত্রীদেরকেও তালাক দেন এবং স্বীয় ধন-সম্পদ স্বীয় ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। উমার (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে বলেন : 'সম্ভবতঃ শাইতান তোমার মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে, তুমি সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এ জন্যই তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছ যেন তারা তোমার সম্পত্তির অংশ না পায়। আর এ কারণেই তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নাও এবং তোমার ছেলেদের নিকট হতে সম্পদ ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি এ কাজ না কর তাহলে তোমার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিব এবং তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকেও তোমার উত্তরাধিকারিণী বানিয়ে দিব। কেননা তুমি তাদেরকে এ ভয়েই তালাক দিয়েছ। আর মনে হচ্ছে যে, তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমার কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার জন্য জনগণকে নির্দেশ প্রদান করব, যেমন আবু রিগালের কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।' (ছামূদ গোত্রের আবু রিগাল ঐ সময় পবিত্র স্থানে ছিল বলে তখন তার উপর আযাব পতিত হয়নি, কিন্তু সে ঐ জায়গা ত্যাগ করার পর তার উপরও আযাব নেমে আসে) (আহমাদ ২/১৪, আল উম্ম ৫/৪৯, তিরমিযী ১১২৮, ইব্ন মাজাহ ১৯৫৩, দারাকুতনী ৩/২৭১, বাইহাকী ৭/১৮২) মারফু' হাদীস পর্যন্ত তো এসব কিতাবেই রয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হল যে, একই সময়ে যদি চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা বৈধ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাইলানকে (রাঃ) দশজন স্ত্রীর মধ্যে যে কোন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট ছয়জনকে তালাক দিতে বলতেননা, কেননা তাঁরা সবাই ঈমান এনেছিলেন। এখানে এটাও স্মরণ রাখার কথা যে, গায়লানের (রাঃ) নিকট তো দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেনই, তথাপি তিনি ছয়জনকে পৃথক করিয়ে দিলেন, তাহলে নতুনভাবে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

একটি বিয়েই উত্তম যদি স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করা সম্ভব না হয়

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে না পারার ভয় থাকে তাহলে একটিকেই যথেষ্ট মনে কর বা দাসীদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

তোমরা কখনও স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা কামনা কর। (সূরা নিসা, ৪ : ১২৯) এখানে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, দাসীদের মধ্যে পালা করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব বটে। যে করে সে ভালই করে এবং যে না করে তারও কোন দোষ নেই। এর পরবর্তী বাক্য ذَلِكَ أَذْنَى এর ভাবার্থে কেহ কেহ বলেছেন, ‘এটা তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অতি নিকটবর্তী।’

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, এর মারফু’ হওয়া ভুল কথা, তবে এটা আয়িশার (রাঃ) উক্তি বটে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরামা, (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), আবু রায়ীন (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), শা‘বী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ) প্রমুখ হতে এর অর্থ করা হয়েছে (ন্যায় থেকে) সরে আসা। (তাবারী ৭/৫৪৯-৫৫১)

স্ত্রীকে মোহর দিতেই হবে

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, وَأَتَوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً এ আয়াতে ‘নিহলাহ’ অর্থ হচ্ছে দেন-মোহর। (তাবারী ৭/৫৫৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) উরওয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, ‘নিহলাহ’ অর্থ হচ্ছে অবশ্য করণীয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যুরাইয (রহঃ) একই কথা বলেছেন। ইব্ন যুরাইয (রহঃ) অতিরিক্ত যোগ করে

বলেন ‘নির্দিষ্ট পরিমাণ’। (তাবারী ৭/৫৫৩) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আরাবী ‘নিহ্লাহ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে যা খুবই দরকার। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার আদেশ হল, ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য দিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করনা’। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই যে, সে দেন-মোহর ছাড়া কোন মহিলাকে বিয়ে করবে অথবা মোহরের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করবে। (তাবারী ৭/৫৫৩) সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্ভূষ্ট চিত্তে, যেমন খুশি মনে কেহকে দান করা হয়, অনুরূপভাবে যথাযথ মর্যাদার দিকে খেয়াল রেখে বিয়ের সময় দেন-মোহর ধার্য করে স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। বিয়ের পরে স্ত্রী যদি তার প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণই ফেরত দেয় তখন তার স্বামী তা ফেরত নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করায় আইনতঃ কোন বাধা নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ : কিন্তু তারা যদি সম্ভূষ্ট চিত্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে বিবেচনা মত তা তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।

৫। আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারণ করেছেন তা অবোধদেরকে প্রদান করনা; বরং তা হতে তাদেরকে ভক্ষণ করাতে থাক, পরিধান করাতে থাক এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।

۵. وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

৬। আর ইয়াতীমরা বিয়ের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় তাহলে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর;

۶. وَابْتَلُوا الَّتِي تَمِي حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অপব্যয়
করনা অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত
হবে বলে ওটা সত্ত্বরতা
সহকারে আত্মসাৎ করনা;
এবং দেখাশোনাকারী যদি
অভাবমুক্ত হয় তাহলে
ইয়াতীমের মাল খরচ করা
হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত
রাখবে, আর যে ব্যক্তি
অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ
ভোগ করবে, অতঃপর যখন
তাদের সম্পত্তি তাদেরকে
সমর্পণ করতে চাও তখন
তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং
আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

নির্বোধ/মূর্খদের সম্পদ প্রদান না করা

মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নির্বোধদেরকে তাদের
সম্পদ প্রদান না করে। ধন-সম্পদ, ব্যবসা ইত্যাদিতে খাটিয়ে আল্লাহ তা'আলা
ওর দ্বারা মানুষের জীবন যাপনের উপায় করে দিয়েছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে
যে, অবোধদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করা হতে বিরত রাখা উচিত। যেমন
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, পাগল, নির্বোধ এবং বেদীন অন্যায়ভাবে স্বীয় ধন-সম্পদ
নিঃশেষে ব্যয় করে ফেলছে, তাদের এভাবে সম্পদ খরচ করা হতে বাধা দিতে
হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির স্কন্ধে বহু ঋণের ভার চেপে গেছে, যে ঋণ সে
তার সমস্ত সম্পদ দিয়েও পরিশোধ করতে পারেনা, যদি মহাজন সে সময়ের
শাসনকর্তার নিকট আবেদন করে তাহলে শাসনকর্তা তার সমস্ত সম্পদ হস্তগত
করবেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে দিবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন
যে, এখানে سُفَهَاءَ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণ। (তাবারী
৭/৫৬২) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), হাকাম ইব্ন উয়াইনা (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

এবং যাহাক (রহঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, سَفَهَا ءَ শব্দের ভাবার্থ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েই বটে। (তাবারী ৭/৫৬২) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পিতৃহীনেরা। (তাবারী ৭/৫৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মহিলাগণ। (তাবারী ৭/৫৬৪)

সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করা উচিত

এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ** তাদেরকেও খাওয়াও, পরাও। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তোমার যে সম্পদকে তোমার জীবন ধারণের উপায় করে দিয়েছেন তা তুমি তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে প্রদান করে তাদের হাতের দিকে চেয়ে থেকনা। বরং তোমার সম্পদ তুমি তোমার দখলেই রেখে ওকে ঠিক রাখ এবং তুমি স্বহস্তে তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর। (তাবারী ৭/৫৭০)

এরপরে বলা হচ্ছে, **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا** তাদের সাথে ভাল কথা বল। অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম ও নম্র ব্যবহার কর। এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত, যার নিজ হাতে খরচ করার অধিকার নেই তার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা ও খবরাখবর লওয়া এবং নম্র ব্যবহার করা উচিত।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইয়াতীমদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ** তোমরা পিতৃহীনদের দেখাশুনা কর যে পর্যন্ত না তারা যৌবনে পদার্পণ করে। এখানে **نِكَاح** শব্দ দ্বারা প্রাপ্ত বয়স বুঝানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত বয়সের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্ন দেখা যায় এবং এক বিশেষ প্রকারের পানি তীব্র বেগে বহির্গত হয়। আলী (রাঃ) বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটি ভালভাবেই স্মরণ আছে :

‘স্বপ্নদোষের পর পিতৃহীনতাও নেই এবং সারা দিনরাত নীরব থাকাও নেই।’ (আবু দাউদ ৩/২৯৩) অন্য হাদীসে আয়িশা (রাঃ) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তিন প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (১) শিশু, যে পর্যন্ত না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না সে জেগে উঠে। (৩) পাগল ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে।’ (আবু দাউদ ৪/৫৫৮-৫৬০) সূতরাং প্রাপ্ত বয়সের নিদর্শন একতো হচ্ছে এই। দ্বিতীয় নিদর্শন কারও কারও মতে এই যে, যখন তার বয়স পনের বছর হবে। এর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি, যাতে তিনি বলেন : ‘উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সঙ্গে নেননি। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করা হলে তিনি সম্মত হন। সে সময় আমার বয়স ছিল পনেরো বছর।’ উমার ইব্ন আবদুল আযীযের (রহঃ) নিকট এ হাদীসটি পৌছলে তিনি বলেন : ‘প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমা এটাই।’ (বুখারী ২৬৬৪, মুসলিম ১৮৬৮)

প্রাপ্ত বয়সের তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে নাভীর নীচে চুল গজান। সঠিক কথা এই যে, সকলের পক্ষেই এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন। কেননা প্রথমতঃ এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। এর দলীল হচ্ছে মুসনাদ আহমাদের হাদীসটি, যাতে আতিয়া কারাযীর (রাঃ) বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন : ‘বানু কুরাইযার যুদ্ধের পর আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হয়। তিনি নির্দেশ দেন : ‘এক ব্যক্তি দেখুক যে, বন্দীদের মধ্যে যাদের এ চুল বের হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং যাদের বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।’ সে সময় আমার এ চুল বের হয়নি বলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।’ (আহমাদ ৪/৩১০, আবু দাউদ ৪/৫৬১, তিরমিযী ৫/২০৭, নাসাঈ ৫/১৮৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, **فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ** সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা দেখ যে, তাদের ধর্ম পালনের সামর্থ্য এবং সম্পদ রক্ষার যোগ্যতা হয়েছে তখন তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য হবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইমামগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৭/৫৭৬) ফিক্হ শাফ্রিবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, শিশু যখন ধর্মীয় বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে এবং টাকা পয়সার হিসাব নিতে সক্ষম হয় তখন তার পক্ষ থেকে যে হিসাব নিকাশ করত তার উচিত হবে সেই বয়ঃপ্রাপ্ত ইয়াতীমের সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়া।

গরীব লালন-পালনকারী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে যুক্তিসঙ্গত খরচ করতে পারবে

ইয়াতীমরা বড় হওয়া মাত্রই তাদের সম্পদ তারা নিয়ে নিবে, শুধুমাত্র এই ভয়ে এর পূর্বেই, প্রয়োজন ছাড়াই তাদের সম্পদ শেষ করে দিবেনা। খবরদার! এ কাজ করা। **وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ** যে লালন-পালনকারী ধনী, সে নিজের সম্পদ থেকেই খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে, তার কর্তব্য হবে ইয়াতীমের সম্পদ হতে কিছুই গ্রহণ না করা। মৃত জন্তু এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ সম্পদ তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। **وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ** তবে হ্যাঁ, যদি অভিভাবক দরিদ্র হয় তাহলে অবশ্যই তাকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক হিসাবে সময়ের প্রয়োজনে ও দেশ/প্রথা অনুযায়ী তার সম্পদ হতে যুক্তি সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, **وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا** আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক এবং তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (তাবারী ৭/৫৯৩, ফাতহুল বারী ৮/৮৯) সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে। যদি প্রয়োজন পরিশ্রম অপেক্ষা কম হয় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। আর যদি পরিশ্রম প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তাহলে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে।

মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার নিকট কোন সম্পদ নেই। একজন পিতৃহীনকে আমি লালন-পালন করছি। আমি তার আহাযের মধ্য হতে কিছু খেতে পারি কি?’ তিনি বললেন : অতিরিক্ত কিংবা অপচয় অথবা নিজের সম্পদের সাথে না মিশিয়ে (আত্মসাতের উদ্দেশ্যে) তোমরা ইয়াতীমের সম্পদ থেকে খেতে পার। কিন্তু নিজের অর্থ বাঁচানোর জন্য তা করা। (আহমাদ ৩/১৮৬) এরপর অভিভাবকদেরকে বলা হচ্ছে :

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ যখন তারা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে এবং তোমরা তাদের মধ্যে বিবেচনা জ্ঞান লক্ষ্য করবে তখন সাক্ষী রেখে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করবে, যেন অস্বীকার করার সুযোগই না আসে।

وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا প্রকৃতপক্ষে সত্য সাক্ষী, পূর্ণ রক্ষক এবং সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ তা‘আলাই রয়েছেন, ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে অভিভাবকের নিয়াত কি ছিল তা তিনি খুব ভালই জানেন।

অভিভাবক নিজেই হয়তবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করেছে, ধ্বংস করেছে এবং মিথ্যা দলীল কিংবা মিথ্যা হিসাব লিখে রেখেছে, অথবা হয়ত সৎ নিয়াতের অধিকারী অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদ পূরাপূরি রক্ষা করেছে এবং সঠিক হিসাব রেখেছে, এসব সংবাদ সেই সবজান্তা এবং মহান রক্ষক আল্লাহ তা‘আলার অবশ্যই জানা রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যারকে (রাঃ) বলেন : ‘হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখছি এবং আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্য তা পছন্দ করি। সাবধান! কখনই তুমি দু’ ব্যক্তিরও নেতা বা আমীর নির্বাচিত হয়েনা এবং কখনও কোন ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েনা।’ (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

৭। পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ।

٧. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

৮। বন্টনের সময়ে যখন স্বজনগণ, ইয়াতীমগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয় তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে

٨. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

সম্ভাবে কথা বল।	<p>فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا</p>
<p>৯। তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিত যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঙ্গত কথা বলে।</p>	<p>৯. وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا</p>
<p>১০। যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।</p>	<p>১০. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا</p>

আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে

উত্তরাধিকারীর কাছে সম্পদ বন্টন করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে)
আরারের মুশরিকদের প্রথা ছিল এই যে, কেহ মারা গেলে তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের তার সমস্ত সম্পদ পেত। তার ছোট সন্তানেরা ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হত। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবারই জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মীয়তাই হোক বা বিবাহ বন্ধনের কারণেই হোক বা আযাদী সম্পর্কিত কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই পাবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উম্মে কুজ্জাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে দু’টি মেয়ে আছে। তাদের পিতা মারা গেছে এবং তাদের নিকট কিছুই নেই।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি (৪ : ৭) নাযিল করেন। (আবু দাউদ ৩/৩১৪) এ হাদীসটি অন্য শব্দে উত্তরাধিকারের অন্য দু’টি আয়াতের তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আসবে। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে :

... وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ
বন্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পড়ে যার কোন অংশ নেই এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরাও এসে যায় তাহলে তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর।’

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এ হুকুম এখনও বহাল আছে। (তাবারী ৮/৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের কোন সম্পদ রয়েছে এবং তাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে যতটুকু খুশি তা অন্যদের মাঝে বিতরণ করতে পারে। (তাবারী ৮/৮) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আবু মূসা (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাকর (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), শা‘বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ) প্রমুখ এ কথাই বলেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মাকলুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ‘আতা ইব্ন আবী রিবাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্ন মুআম্মার (রহঃ) বলেছেন যে, এটা বাধ্যতামূলক। এমনকি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ছাড়া এসব বিজ্ঞজন এ হুকুমকে ওয়াজিব বলেছেন।

কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি রহিতই হয়ে গেছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবও (রহঃ) এটাই বলেন যে, যদি ঐ লোকদের জন্য অসীয়াত থাকে তাহলে সেটা অন্য কথা নচেৎ এ আয়াতটি মানসুখই বটে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এখানে বন্টনের অর্থ হচ্ছে মীরাসের বন্টন। সুতরাং ‘মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সময় যদি এসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ

বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দিওনা। তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ পছন্দ করেননা। সুতরাং আল্লাহর পথে সাদাকাহ হিসাবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর যেন তারা খুশি হয়ে যায়।’

ন্যায়ানুগ অসীয়াত করা উচিত

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلَيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ

... তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিত যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর সময় অসীয়াত করে যাচ্ছে এবং সেই অসীয়াতে তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি হচ্ছে এমতাবস্থায় যে তা শ্রবণ করছে তার আল্লাহকে ভয় করে ঐ অসীয়াতকারীকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করা উচিত এবং তার কর্তব্য এই যে, সে যেন ঐ অসীয়াতকারীর মঙ্গল কামনা করে যেমন সে নিজের উত্তরাধিকারীদের মঙ্গল কামনা করে, যখন তাদের ক্ষতির ও ধ্বংসের আশংকা থাকে। (তাবারী ৮/১৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাকে দেখতে যান। সে সময় সা‘দ (রাঃ) তাঁকে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বহু সম্পদ রয়েছে এবং আমার একটি মাত্র কন্যা আছে। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দেই। আপনি আমাকে এর অনুমতি দিবেন কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘না।’ তিনি বলেন : ‘আচ্ছা, অর্ধেকের অনুমতি আছে কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘না।’ তিনি বলেন : ‘তাহলে এক তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি যদি তোমার পিছনে তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাও তাহলে এটা ওটা হতে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে দরিদ্র রূপে ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।’ (ফাতহুল বারী ৫/৪২৭, মুসলিম ৪/১২৫৩)

যারা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তাদেরকে হুশিয়ারী

আয়াতের দ্বিতীয় ভাবার্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি এরূপই খেয়াল রাখ যেমন তুমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার ছোট সন্তানদের প্রতি অন্য লোকদের খেয়াল রাখার কামনা কর। তুমি যেমন চাওনা যে, তাদের সম্পদ অন্যেরা অন্যায়ভাবে খেয়ে নিক এবং তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দরিদ্র থেকে যাক, তদ্রূপ তুমিও অন্যদের সন্তানদের সম্পদ খেওনা। এ ভাবার্থও খুব উত্তম বটে। এ কারণেই এর পরেই পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের শাস্তির কথা বলা হয় :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সাতটি এমন পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাক যা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।’ তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় : পাপগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : (১) ‘আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন, (২) যাদু, (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) পিতৃহীনদের সম্পদ ভক্ষণ করা, (৬) জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মুসলিম নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।’ (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

১১। আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন : এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের তুল্য; আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তাহলে সে

۱۱. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ

অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে তাহলে মাতা-পিতার জন্য অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকেরই জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে, আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু মাতা-পিতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তাহলে তার মাতার জন্য রয়েছে এক তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা থাকে তাহলে সে যা নির্দেশ করে গেছে সেই নির্দেশ ও ঋণ প্রদান শেষে তার জননীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ; তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী তা তোমরা অবগত নও, এটাই আল্লাহর নির্দেশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ع
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ^ع فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ع
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الْسُّدُسُ^ع مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط ءِآبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا^ع فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^ط
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

মিরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন জানতে উৎসাহিত করা হয়েছে

এ আয়াতটি, এর পরবর্তী আয়াতটি এবং সূরার শেষের আয়াতটি ইল্মে ফারায়েযের আয়াত। পূর্ণ ইল্মের দলীলরূপে এ আয়াতগুলিকে এবং হাদীসগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, হাদীসগুলি যেন এ আয়াতগুলিরই তাফসীর ও ব্যাখ্যা। এখানে আমরা এ আয়াতটিরই তাফসীর

লিখছি। বাকী মীরাসের যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং ওতে যে দলীলসমূহের অনুধাবনে কিছু মতভেদ আছে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে আহকামের পুস্তকসমূহ-তাকসীর নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদেরকে সাহায্য করুন! ফারায়েয বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। ইবন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, মীরাসের জ্ঞান (উত্তরাধিকারের বন্টন) অর্জন করা হল সমস্ত জ্ঞানের অর্ধেক অর্জন করা, কারণ এর ফলাফল সকলের সাথে জড়িত। এ আয়াতসমূহে যে নির্ধারিত অংশসমূহের বর্ণনা রয়েছে সেগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪ : ১১ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাকসীরে যাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ‘আমি রুগ্ন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বাকর (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। বানু সালামার মহল্লায় তাঁরা পদব্রজে আগমন করেন। আমি সে সময় অজ্ঞান ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি চেয়ে নিয়ে উঠে বসেন। অতঃপর আমার উপর উঠুর পানি ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তখন বলি : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বন্টন করব? সেই সময় **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حَظِّ**

الأنثيين এ পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৯১, মুসলিম ৩/১২৩৫, নাসাঈ ৬/৩২০) ছয়টি হাদীস গ্রন্থের অন্যান্য হাদীসেও এটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/১১৮, মুসলিম ৩/১২৩৪, আবু দাউদ ৩/৩০৮, তিরমিযী ৮/৩৬৮, নাসাঈ ১/৭৭ ইবন মাজাহ ২/৯১১)

৪ : ১১ আয়াতটি সম্পর্কে যাবিরের (রাঃ) উক্তি

আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সা‘দ ইবন রাবী’র (রাঃ) সহধর্মিণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ দু’টি সা‘দের (রাঃ) কন্যা, এদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক ছিলেন। ঐ যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেয়। এদের জন্য কিছুই রাখেনি। এটা স্পষ্ট কথা যে, সম্পদ ছাড়া এদের বিয়ে হতে পারেনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন : ‘এর ফাইসালা স্বয়ং আল্লাহ

সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলাই করবেন।’ সে সময় উত্তরাধিকারের আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের চাচার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেন :

‘দুই তৃতীয়াংশ (তোমার ভাইয়ের সম্পত্তির) এ মেয়েদেরকে দিয়ে দাও, এক অষ্টমাংশ এদের মাকে প্রদান কর এবং বাকি তোমার অংশ।’ (আহমাদ ৩/৩৫২, আবু দাউদ ৩/৩১৪, তিরমিযী ৬/২৬৭, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৮) বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, যাবিরের (রাঃ) প্রশ্নের উপর এ সূরাটির শেষ আয়াত (৪ : ১৭৬) অবতীর্ণ হয়ে থাকবে অর্থাৎ এ আয়াতটি (৪ : ১১) নয়। অতিসত্বরই ইনশাআল্লাহ এ বর্ণনা আসছে। কেননা তার উত্তরাধিকারিণী তো শুধুমাত্র তার বোনেরা ছিল। তাঁর মেয়ে তো ছিলইনা। তিনি তো ‘কালালাহ’^১ ছিলেন। আর এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অর্থাৎ সাদ ইব্ন রাবীর (রাঃ) উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এর বর্ণনাকারীও হচ্ছেন স্বয়ং যাবির (রাঃ)। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকেও এ আয়াতের তাফসীরেই এনেছেন। এ জন্য আমরাও তার অনুসরণ করেছি।

পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে

উপরোক্ত আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা তাদের সমস্ত সম্পদ শুধু ছেলেদেরই প্রদান করত এবং মেয়েদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করত। তাই আল্লাহ তা‘আলা মেয়েদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেন। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন। কেননা যতগুলি কর্তব্য পালন পুরুষদের দায়িত্বে রয়েছে ততটা স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই। যেমন পরিবারের খাওয়া পরার জন্য আয় ব্যয়ের দায়িত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে হয়। এ জন্যই তাদের প্রয়োজন অনুপাতে তাদেরকে মহিলাদের দ্বিগুণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা হতেও বহু গুণে দয়ালু ও স্নেহশীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। মা তার শিশুর খোঁজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে

^১ যে ব্যক্তির পিতা ও পুত্র থাকেনা তাকে ‘কালালাহ’ বলে।

শিশুকেই পায় তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বলেন :

‘আচ্ছা বলত, ইচ্ছাকৃতভাবে কি এ মহিলাটি তার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?’ সাহাবীগণ উত্তরে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কখনই না!’ তিনি তখন বলেন : ‘আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও বেশি দয়ালু।’ (মুসলিম ৪/২১০৯)

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে অংশীদার ও হকদার শুধু পুত্রই ছিল। পিতা-মাতা অসীয়াত হিসাবে কিছু পেত মাত্র। আল্লাহ তা‘আলা এটা রহিত করে দেন এবং পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ, পিতা-মাতাকে এক ষষ্ঠাংশ ও এক তৃতীয়াংশও বটে, স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ, স্বামীকে এক চতুর্থাংশ ও অর্ধেক দেয়ার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৯৩)

শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান থাকলে তার উত্তরাধিকারের অংশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا تَرَكَ (আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে) فَوْقَ শব্দটিকে কেহ কেহ অতিরিক্ত বলে থাকেন। যেমন فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ (সূরা আনফাল, ৮ : ১২) এর মধ্যে فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত। কিন্তু আমরা এটাকে স্বীকার করিনা। এ আয়াতেওনা, ঐ আয়াতেওনা। কেননা কুরআনুল হাকীমে এমন কোন অতিরিক্ত জিনিস নেই যা বিনা উপকারে আনা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কালামে এরূপ হওয়া অসম্ভব। আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি এরূপই হত তাহলে ওর পরে فَلَهُنَّ আসতনা, বরং فَلَهُمَا আসত। তবে হ্যাঁ, এটা দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, যদি মেয়ে দু’য়ের অধিক না হয়, অর্থাৎ শুধু দু’টিই হয় তাহলেও এটাই হুকুম অর্থাৎ তারাও দুই তৃতীয়াংশই পাবে। কেননা দ্বিতীয় আয়াতে দু’ বোনকে দুই তৃতীয়াংশ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যদি দু’ বোন দুই তৃতীয়াংশ পায় তাহলে দু’ মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ পাবে না কেন? তাদের জন্য তো দুই তৃতীয়াংশ হওয়া আরও বাঞ্ছনীয়।

অন্য হাদীসে এসেছে যে, দু’টি কিংবা তদোর্ধ মেয়েকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ দিয়েছেন।

যেমন এ আয়াতের শান-ই নয়ূলের বর্ণনায় সা'দের কন্যাদের ব্যাপারে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে এটাও এর দলীল যে, যদি পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা থাকে তাহলে সে অর্ধেক অংশ পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তাহলে সে অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে। সুতরাং যদি দু'টি কন্যা থাকা অবস্থায়ও অর্ধেক অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া উদ্দেশ্যে হত তাহলে এখানে তা বর্ণনা করা হত। এককে যখন পৃথক করা হয়েছে তখন জানা যাচ্ছে যে, দুইয়ের বেশি থাকা অবস্থায় যে হুকুম দু'জন থাকা অবস্থায়ও সেই হুকুম।

উত্তরাধিকারে মা-বাবার প্রাপ্য অংশ

অতঃপর বাবা-মায়ের অংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাবা-মায়ের অবস্থা বিভিন্ন রূপ।

(১) প্রথম অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক সন্তান থাকে এবং পিতা-মাতাও থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়েই এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ পাবে পিতা এবং এক ষষ্ঠাংশ পাবে মাতা। আর যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র কন্যা থাকে তাহলে অর্ধেক সম্পদ মেয়েটি পাবে এবং এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে ও এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে, আরও যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকছে ওটাও বাপ 'আসাবা' হিসাবে পেয়ে যাবে। তাহলে এখানে পিতা তার নির্ধারিত এক ষষ্ঠাংশ পেয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে 'আসাবা' হিসাবেও অবশিষ্ট অংশ পেয়ে যাচ্ছে।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা। এ অবস্থায় মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ পিতা 'আসাবা' হিসাবে পেয়ে যাবে। তাহলে পিতা দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ মায়ের তুলনায় বাপ দ্বিগুণ পাবে। এখন যদি মৃতাত্ত্বীর স্বামীও বিদ্যমান থাকে কিংবা মৃত স্বামীর স্ত্রী থাকে, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নেই, বরং আছে শুধু পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রী, তাহলে এ ব্যাপারে তো আলেমগণ একমত যে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে অর্ধেক এবং স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ। স্বামী বা স্ত্রীর (অংশ) নেয়ার পর যা বাকী থাকবে মা তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। হয় স্ত্রী স্বামী ছেড়ে যাক বা স্বামী স্ত্রী ছেড়ে যাক। কেননা অবশিষ্ট সম্পদ তাদের ব্যাপারে যেন পূরা সম্পদ। আর মায়ের অংশ

হচ্ছে বাপের অর্ধেক। সুতরাং অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মা নিয়ে নিবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বাপ প্রাপ্ত হবে।

(৩) বাপ-মায়ের তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনদের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হয়, তারা সহোদর ভাইই হোক অথবা বৈপিত্রের ভাইই হোক। এ অবস্থায় বাপের বিদ্যমানতায় ভাইয়েরা কিছুই পাবেনা, তবে তারা মাকে এক তৃতীয়াংশ হতে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে দিবে। আর যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারীই না থাকে এবং মায়ের সাথে শুধু বাপ থাকে তাহলে বাকী সম্পদ সমস্তই বাপ পেয়ে যাবে। জমহুরের এটাই উক্তি। সাঈদ ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। তবে হ্যাঁ, যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র ভাই থাকে তাহলে সে মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরাতে পারবেনা। উলামা-ই কিরামের ঘোষণা মতে এতে নিপুণতা রয়েছে এই যে, ভাইদের বিয়ে, খাওয়া, পরা ইত্যাদির খরচ বহন পিতারই দায়িত্বে রয়েছে, মাতার দায়িত্বে নেই। সুতরাং পিতাকে অধিক দেয়ার মধ্যেই হিকমাত নিহিত রয়েছে। এটা উত্তম উক্তি। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ভাইয়েরা মায়ের যে এক ষষ্ঠাংশ কমিয়ে দিল তা পিতা পাবেনা, বরং ওরাই পাবে। ঐ উক্তি খুবই বিরল। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ উক্তি সমস্ত উম্মাতের বিপরীত।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **كَأَلَّةٌ** ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পিতা না থাকে।

প্রথমে দেনা, পরে অসীয়াত এবং সবশেষে উত্তরাধিকারের বন্টন হতে হবে

এরপরে বলা হচ্ছে : **مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ** অসীয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর মীরাস বন্টিত হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মনীষী এতে একমত যে, ঋণ অসীয়াতের অগ্রবর্তী। আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি গভীর চিন্তা সহকারে লক্ষ্য করলে এটাই পরিলক্ষিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমি পিতা ও পুত্রগণকে প্রকৃত মীরাসে নিজ নিজ নির্ধারিত অংশ গ্রহণকারী করেছি এবং অজ্ঞতা যুগের প্রথা দূর করেছি। বরং ইসলামেও প্রথমে সম্পদ শুধুমাত্র সন্তানদেরকে দেয়ার নির্দেশ ছিল এবং বাপ মা শুধু অসীয়াত হিসাবে কিছু লাভ করত, যেমন ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা সেটাকেও রহিত করে দিয়েছেন।

এখন এ হুকুম হচ্ছে যে, পিতার দ্বারা তোমাদের বেশি উপকার সাধিত হবে কি পুত্রের দ্বারা হবে তা তোমাদের জানা নেই। উভয় হতেই উপকারের আশা রয়েছে। এদের একের অপর হতে বেশি উপকার লাভের নিশ্চয়তা নেই। পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশি উপকার লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে, আবার পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারাও বেশি উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।’

এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ঐ নির্ধারিত অংশ ও উত্তরাধিকারের এ আহকাম আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে ফার্ব্য করা হয়েছে। কোন আশায় বা ভয়ে এতে কম-বেশি করার কোন স্থান নেই। না কেহকে বঞ্চিত করা যাবে, না কেহকে বেশি দেয়া যাবে। আল্লাহ তা‘আলা সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞ। যে যার হকদার তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের স্থান তিনি খুব ভালই জানেন। তোমাদের লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর কোন কাজ ও কোন নির্দেশ নিপুণতা শূন্য নয়। সুতরাং তাঁর নির্দেশাবলী তোমাদের মেনে চলা উচিত।

১২। আর তোমাদের পত্নীগণের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তারা যা পরিত্যাগ করে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য উহার অর্ধাংশ; কিন্তু যদি তাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে তারা যা অসীয়াত করেছে সেই অসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ; এবং যদি তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তোমরা যা পরিত্যাগ করে যাবে, তাদের জন্য তার এক চতুর্থাংশ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি

১২. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ ذَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

থাকে তাহলে তোমরা যা অসীয়াত করবে সেই অসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তাদের জন্য এক অষ্টমাংশ; যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায় এবং তার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে তাহলে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহলে কৃত অসীয়াত পূরণ করার পর অথবা ঋণ শোধের পর, কারও অনিষ্ট না করে তারা উহার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে; এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহিষ্ণু।

الَّذِينَ مِمَّا تَرَكَتُمْ^ع مِّنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَالَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ^ع فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الْثُلُثِ^ع مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

উত্তরাধিকারে স্বামী/স্ত্রীর প্রাপ্য

আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলছেন যে, স্ত্রী যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার স্বামী স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অর্ধেক পাবে, আর সে (স্ত্রী) যদি সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে তার সম্পদ থেকে পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে বাকি সম্পদ থেকে তার স্বামী চার ভাগের এক ভাগ প্রাপ্ত হবে।

শৃংখলা বিধান হচ্ছে এই যে, পূর্বে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তারপরে তাদের অসীয়াত পূরণ করতে হবে এবং পরে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ

বন্টিত হবে। এটা এমন একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় যার উপর উম্মাতের সমস্ত আলেমের ইজমা রয়েছে। এ মাসআলায় পুত্রের হুকুমে পৌত্র রয়েছে। এমনকি তাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানও এ হুকুমেরই আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তাদের বিদ্যমানতায়ও স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্ত্রীদের অংশের কথা বলছেন :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ তারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে বা এক অষ্টমাংশ পাবে। স্বামীর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ পাবে এবং সন্তান থাকলে এক অষ্টমাংশ পাবে। এই এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশের মধ্যে মৃত স্বামীর সমস্ত স্ত্রীই জড়িত থাকবে। চারজন, তিনজন বা দু’জন হলে তাদের মধ্যে এই অংশ সমানভাবে বন্টিত হবে। আর যদি একজনই হয় তাহলে সম্পূর্ণ অংশ সে একাই পাবে।

‘কালাহ’ শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, ... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً (যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায় ...) كَلَالَةً শব্দটিকে أَكْلِيلُ শব্দ হতে বের করা হয়েছে। أَكْلِيلُ ঐ মুকুট ইত্যাদিকে বলা হয় যা মস্তককে চতুর্দিক হতে ঘিরে নেয়। এখানে এর ভাবার্থ এই যে, তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে চার পাশের লোক। তার আসল ও ফরা’ অর্থাৎ মূল ও শাখা নেই।

আবু বাকরকে (রাঃ) كَلَالَةً শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ‘আমি আমার মতানুসারে উত্তর দিচ্ছি। যদি সেটা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকেই হবে। আর যদি ভুল হয় তাহলে শাইতানের পক্ষ থেকে হবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হবেন। كَلَالَةً তাকেই বলে যার পিতা ও পুত্র থাকেনা।’ উমার ফারুক (রাঃ) খলীফা হলে তিনিও তাঁর অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন এবং বলেন আবু বাকরের (রাঃ) মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমি লজ্জাবোধ করি।’ (তাবারী ৮/৫৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আমিই শেষ ব্যক্তি যে উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সাথে কথা

বলেছে। তিনি আমাকে বলেছেন : তুমি যা বলেছ তা সঠিক মতামত। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কোন্ বিষয়ে আমি কি বলেছি? তিনি বললেন : সঠিক কথা এই যে, **كَلَالَةُ** তাকেই বলা হয় যার মা-বাবা ও সন্তান নেই’। (তাবারী ৮/৫৯) আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ), আসাবী (রাঃ), নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং হাকামও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ৮/৫৫-৫৭) মাদীনাবাসী, কুফাবাসী এবং বসরাবাসীরও এটাই উক্তি। সাতজন ধর্মশাস্ত্রবিদ, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বিজ্ঞ উলামাগণও এটাই বলেন।

মায়ের পূর্ব-স্বামীর সন্তানদের প্রাপ্য অংশ

অতঃপর বলা হচ্ছে, **وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ** তার ভাই অথবা বোন থাকে, অর্থাৎ মা পক্ষীয় ভাই বা বোন যেমন সা’দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষীর কিরআত রয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু বাকর (রাঃ) প্রভৃতি (মহামানব) হতেও এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। **فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ** (তাহলে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহলে এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে) মাতাজাত ভ্রাতাগণ কয়েকটি কারণে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ হতে পৃথক। প্রথমতঃ তারা উত্তরাধিকার হিসাবে মায়ের সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে। যেমন মা। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী অর্থাৎ ভাই ও বোন সমান সমান মীরাস পাবে। তৃতীয় এই যে, তারা শুধুমাত্র ঐ সময়েই উত্তরাধিকারী হবে যখন মৃত ব্যক্তি পিতা ও পুত্রহীন হবে। সুতরাং তারা পিতা ও পিতামহ এবং পুত্র ও পৌত্রের বিদ্যমানতায় উত্তরাধিকারী হবেনা। চতুর্থ এই যে, তারা এক তৃতীয়াংশের বেশি কোন অবস্থায়ই পায়না, তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন এবং পুরুষই হোক অথবা মহিলাই হোক।

অতঃপর বলা হচ্ছে, ‘এই মীরাস বন্টন অসীয়াত কিংবা দেনা শোধ করার পরে হতে হবে। অসীয়াত এমন হবে যে, যেন কোন অবিচার করা না হয়, কারও কোন ক্ষতি না হয়, কেহ অত্যাচারিত না হয়, কোন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার

যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিংবা আল্লাহ যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তার চেয়ে যেন কোন কম বেশি না হয়। এর বিপরীত অসীয়াতকারী এবং এরূপ শারীয়াত বিরোধী অসীয়াতের ব্যাপারে চেষ্টাকারী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর শারীয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে : আল্লাহ যাদের জন্য প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের জন্য কোন অসীয়াত নেই। (আবু দাউদ ২৮৭০, তিরমিযী ২১২১, নাসাঈ ৩৬৭৩, ইব্ন মাজাহ ২৭১২, ২৭১৩)

১৩। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ; এবং যে কেহ আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং এটাই বড় সফলতা।

۱۳. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১৪। আর যে কেহ আল্লাহ ও তদীয় রাসুলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

۱۴. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

উত্তরাধিকারী আইনের সীমা লংঘন করার ব্যাপারে হুশিয়ারী

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয় ও তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। এরূপ লোকদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। অর্থাৎ এসব অবশ্য করণীয় কাজ এবং এর পরিমাণ যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে তাদের আত্মীয়তার নৈকট্য এবং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যার জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করেছেন এগুলি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা, তোমরা এগুলি ভেঙ্গে দিওনা অথবা অতিক্রম করনা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশাবলী মেনে নেয়, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কোন উত্তরাধিকারীকে কম বেশি দেয়ার চেষ্টা করেনা, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ পূরাপুরি পালন করে, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন :

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারাই সফলকাম হবে এবং তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পরিবর্তন করে, কোন ওয়ারিসের মীরাস কম/বেশি করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেনা, বরং তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ করে বা তাঁর বন্টনকে ভাল চোখে দেখেনা কিংবা তাঁর আদেশকে ন্যায় মনে করেনা, তারা চিরস্থায়ী অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'একটি লোক সত্তর বছর পর্যন্ত সাওয়াবের কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসীয়াতের সময় অন্যায় ও অবিচার করে, ফলে তার পরিণতি খারাপ কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।' অপরপক্ষে আর একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত অসৎ কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে স্বীয় অসীয়াতে ন্যায় পন্থা অবলম্বন করে, ফলে

তার পরিণতি ভাল কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে।

অতঃপর এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : ‘তোমরা تَلْكَ হতে مُهِينٌ পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ কর।’ (আহমাদ ২/২৭৮)

সুনান আবু দাউদে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘একজন পুরুষ অথবা মহিলা ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যের কাজে লেগে থাকে, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় অসীয়াতের ব্যাপারে কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ করে, তখন তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়’। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا হতে শেষ পর্যন্ত (৪ : ১২) পাঠ করেন। (আবু দাউদ ৩/২৮৮, তিরমিযী ৬/৩০৪, ইব্ন মাজাহ ২/৯০২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

১৫। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জ কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর; অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।

১৫. وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

১৬। আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দুইজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান

১৬. وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا

কর; কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে এবং সদাচারী হয় তাহলে এতদুভয় হতে প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, করুণাময়।

وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

ব্যভিচারিনীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখার শাস্তি পরে রহিত হয়ে যায়

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সত্য সাক্ষ্য দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশ্লীলতা প্রমাণিত হলে তাকে যেন বাড়ীর বাইরে যেতে দেয়া না হয়, বরং মৃত্যু পর্যন্ত বাড়ীতেই যেন আটক রাখা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তবে হ্যাঁ, এটা অন্য কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন পূর্বের ঐ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের জন্য এ নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশ চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হয়। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), 'আতা খুরাসানী (রহঃ), আবু সালেহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), এবং যাহ্‌হাকেরও (রহঃ) এটাই উক্তি যে, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে সবাই একমত।

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন তা তাঁর উপর খুবই ক্রিয়াশীল হত এবং তিনি কষ্ট অনুভব করতেন ও তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত। একদা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ করেন। অহীর সময়কালীন অবস্থা দূর হলে তিনি বলেন :

‘তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পথ নির্দেশ করেছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করে তাহলে তাদেরকে

একশ চাবুক মারতে হবে, অতঃপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে এবং এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। (আহমাদ ৫/৩১৭, মুসলিম ৩/১৩১৬, আবু দাউদ ৪/৫৭০, তিরমিযী ৪/৭০৫, নাসাঈ ৪/২৭০, ইব্ন মাজাহ ২/৮৫২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا

কাজ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এই শাস্তি হল তাদেরকে তিরস্কার কর, অপদস্থ কর, জুতা পেটা কর ইত্যাদি। (তাবারী ৮/৮৫) চাবুক মারা ও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আইনের মাধ্যমে এ নির্দেশও রহিত হয়ে যায়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি দুই পুরুষের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ তিনি লুতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারটি বলতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘কেহকে তোমরা লুতের (আঃ) কাওমের কাজ করতে দেখলে তাকে এবং যার উপরে সে সেই কাজ করেছে তাকেও হত্যা কর।’ (আবু দাউদ ৪/৬০৭, তিরমিযী ৫/২১, নাসাঈ ৪/৩২২, ইব্ন মাজাহ ২/৮৫৬) এরপর বলা হচ্ছে :

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا

বিরত থাকে এবং সংশোধিত হয় তাহলে তোমরা তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করনা। কেননা পাপ হতে প্রত্যাবর্তনকারী নিস্পাপ ব্যক্তির মতই।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, করুণাময়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যভিচার করে তখন যেন সে তাকে চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদান করে এবং তার উপর আর যেন কোন শাসন গর্জন না করে।’ (ফাতহুল বারী ৪/৪৯, মুসলিম ৩/১৩৩৮)

<p>১৭। তাওবাহ কবুল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর রয়েছে তা তো শুধু তাদেরই জন্য যারা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে থাকে, অতঃপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে; সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।</p>	<p>۱۷. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا</p>
<p>১৮। আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও ক্ষমা নয় যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে; তাদেরই জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।</p>	<p>۱۸. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا</p>

মৃত্যু পর্যন্ত তাওবাহ কবুল হওয়ার সময়

মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন যারা অজ্ঞানতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর তাওবাহ করে, যদিও এ তাওবাহ মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখার পূর্বে ঘড়ঘড় শব্দ হওয়ার পূর্বেই হয়।

মুজাহিদ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন, ইচ্ছা পূর্বকই হোক আর ভুল বশতঃই হোক যে কেহই আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য হয় সেই অজ্ঞ, যে পর্যন্ত না সে তা হতে বিরত হয়।’ (তাবারী ৮/৮৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আবুল আলিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) বলতেন, আল্লাহর বান্দা যে পাপ করে তা তারা না জানার কারণে অজ্ঞতা বশতঃই করে থাকে। (তাবারী ৮/৮৯) আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মা‘মর (রহঃ) বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, সাহাবীগণ বলতেন : ‘বান্দা যে পাপ করে তা ইচ্ছা করেই করুক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক, অজ্ঞতা বশতঃই করে। (আবদুর রায্যাক ১/১৫১)

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ এ আয়াতে অবিলম্বে তাওবাহ করে নেয়ার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মরণের মালাক/ফেরেশতাকে দেখে নেয়ার পূর্বে মৃত্যু যন্ত্রণার সময়কে ‘অবিলম্বে’ বলা হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তৎক্ষণাত তাওবাহ করার অর্থ হচ্ছে তার শেষ নিঃশ্বাস যখন কণ্ঠ নালীর কাছে এসে উপস্থিত হয়। (তাবারী ৮/৯৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দার শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালীতে না পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তার তাওবাহ কবুল করেন। (আহমাদ ২/১৩২, তিরমিযী ৯/৫২১, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন। ইব্ন মাজাহ (রহঃ) একে ভুলবশতঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে রিওয়ায়াতকারী বলেছেন। আসলে তিনি হবেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)।

فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا তবে হ্যাঁ, যখন সে জীবন হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে, মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে পাবে এবং আত্মা দেহ হতে বেরিয়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাবে এবং গড়গড়া শুরু হয়ে যাবে তখন তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা। এ জন্যও আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘জীবন ভর যে পাপ কাজে লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু অবলোকন করে বলে, ‘এখন আমি তাওবাহ করছি’ এরূপ লোকের তাওবাহ গৃহীত হয়না।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল : আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮৪) অন্য জায়গায় রয়েছে :

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا

যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন নেক কাজ করেনি তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫৮) ভাবার্থ এই যে, যখন মানুষ সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখবে তখন যে কেহ ঈমান আনবে অথবা সৎ কাজ সম্পাদন করবে তার সে সৎকাজ বা ঈমান কোন উপকারে আসবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ যারা কুফর ও শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করে তাদেরও তাওবাহয় কোন উপকার হবেনা, তাদের নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ বা বিনিময়ও নেয়া হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত পর্দা পড়ে না যায়’। তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, ‘পর্দা পড়ে যাওয়ার অর্থ কি?’ তিনি বলেন : ‘শিরকের অবস্থায় প্রাণ বহির্গত হওয়া। (আহমাদ ৫/১৭৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا এরূপ লোকদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।

১৯। হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত

۱۹. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ

তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ উহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে বাধ্য করনা এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে সম মর্যাদায় অবস্থান কর; কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন।

كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

২০। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক তাহলে তোমরা তন্মধ্য হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করনা; তাহলে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করে সেটা গ্রহণ করবে?

۲۰. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ
مَكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا
وَإِنَّمَا مُبِينًا

২১। এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট গমন করেছিলে এবং তারা

۲۱. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ
أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

<p>তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।</p>	<p>وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا</p>
<p>২২। তোমাদের পিতৃগণ নারীকুলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা, কিন্তু যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ।</p>	<p>۲۲. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا</p>

‘উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত মহিলা’ কী

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হত। সে ইচ্ছা করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিত, ইচ্ছা করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিত, আবার ইচ্ছা করলে তাকে আর বিয়েই দিতনা। ঐ মহিলাটির আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশি হকদার মনে করা হত। অজ্ঞতা যুগের এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে বলা হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও।
(ফাতহুল বারী ৮/৯৩)

স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়া যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
স্ত্রীদের বাসস্থানকে সংকীর্ণ করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করনা যে, তারা যেন সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় বা তাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন হক পরিত্যাগ করে। কেননা তাদেরকে শাসন গর্জন করে এই কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। এরপর বলা হচ্ছে :

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ কিন্তু যদি তাদের দ্বারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।' ইব্ন মাসউদ (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন শীরীন (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাশানী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবু কিলাবা আল সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন আবী হিলাল (রহঃ) বলেছেন যে, প্রকাশ্য অশ্লীলতার অর্থ হচ্ছে ব্যভিচার। অর্থাৎ সে সময় স্ত্রীদের নিকট হতে মোহর ফিরিয়ে নেয়া বৈধ। সে সময় তাদের জীবনকে সঙ্কটময় করে তোলা উচিত, যেন তারা খোলা করে নিতে বাধ্য হয়।' (তাবারী ৮/১১৫-১১৭) যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে :

وَلَا سَحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জাযিয় নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা হ্রাস রাখতে পারবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখের মতে, এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা, তার অবাধ্য হওয়া, তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা, তার হক পূরাপুরি আদায় না করা ইত্যাদি। (তাবারী ৮/১১৭)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ, এর মধ্যে ব্যভিচারও রয়েছে এবং এ আচরণও রয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর জীবন সংকটপূর্ণ করে তোলা বৈধ, যেন সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় ও পরে তাকে পৃথক করে দেয়। ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) এ কথা খুবই যুক্তিযুক্ত।

স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনকভাবে সদ্ভাবে বসবাস করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। সাধ্যানুযায়ী নিজের অবস্থাও ভাল রাখ। তোমরা যেমন চাও যে, তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে

সুসজ্জিতা থাকুক, তদ্রূপ তোমরাও তাদের মনস্তৃষ্টির জন্য নিজেদেরকে সুন্দর সাজে সজ্জিত রাখ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামী) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারকারী হয়। তোমাদের মধ্যে আমিই আমার পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী।’ (ফাতহুল বারী ১০/৩৯৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করতেন, তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তাদেরকে সদা খুশি রাখতেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতেন, তাদের অন্তর তিনি স্বীয় মুষ্টির মধ্যে রাখতেন, তাঁদের জন্য উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন, প্রশান্ত মনে তাদের উপর খরচ করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলতেন যে, তারা হেসে উঠতেন। এমনও ঘটেছে যে, তিনি উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশার (রাঃ) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। সে দৌড়ে আয়িশা (রাঃ) আগে বেড়ে যান। কিছু দিন পর আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলে আয়িশা (রাঃ) পিছনে পড়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘শোধ বোধ হয়ে গেল।’ (আবু দাউদ ৩/৬৬) এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য ছিল আয়িশাকে (রাঃ) সন্তুষ্ট রাখা।

যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রি যাপনের পালা পড়তো সেখানে তাঁর সমস্ত সহধর্মিণীগণ একত্রিত হতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন, আলাপ আলোচনা হত এবং মাঝে মাঝে এমনও হত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন। অতঃপর তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন এবং তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন। স্বীয় সহধর্মিণীর সাথে একই চাদরে শয়ন করতেন, জামা খুলে ফেলতেন, শুধু লুঙ্গি পরে থাকতেন। ইশার সালাতের পর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ এ কথা সেকথা বলতেন যেন সহধর্মিণীদের মন খুশি হয়। মোট কথা, তিনি স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন। সুতরাং মুসলিমদেরও স্ত্রীদের সাথে প্রেম-প্রীতি বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১) এর বিস্তারিত আহকাম বর্ণনার জায়গা তাফসীর নয়, বরং ওর জন্য ঐ বিষয়েরই গ্রন্থরাজি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

মন না চাইলেও স্ত্রীদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করার মধ্যেই এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ওর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বড় রকমের মঙ্গল দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, হয়তো তাদের গর্ভে সৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন। বিগ্গহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

কোন 'মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আধটি কথায় অসন্তুষ্টও হয় তাহলে তার স্ত্রী অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা অবশ্যই তাকে সন্তুষ্টও করবে।' (মুসলিম ১/১০৯১)

মোহর ফিরিয়ে নেয়ায় নিষেধাজ্ঞা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا তোমাদের কেহ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে এবং তার স্থানে অন্যকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর হতে কিছুই ফিরিয়ে না নেয়, যদিও তাকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করে থাকে। সূরা আলে ইমরানে 'কিনতারা' শব্দের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রচুর সম্পদ প্রদান করাও বৈধ। উমার (রাঃ) প্রথমে প্রচুর মোহর দিতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তার সে কথা ফিরিয়ে নেন।

যেমন মুসনাদ আহমাদে আবুল আইফা আস সুলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উমারকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন : 'তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা। যদি এটা পার্থিব ব্যাপারে কোন ভাল জিনিস হত বা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুত্তাকী পরিচয়ের কাজ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্ব প্রথম ওর উপর আমল করতেন। তিনি তো তাঁর

কোন স্ত্রীর বা কন্যার মোহর বারো আউকিয়ার (প্রায় ৪০০ দিরহাম) বেশি নির্ধারণ করেননি। মানুষ অতিরিক্ত মোহর বেঁধে বিপদে পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী তার উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে যায় এবং তার অন্তরে তার প্রতি শত্রুতার সৃষ্টি হয়।’

এ হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনা ক্রমের মাধ্যমে এ হাদীসটি তার সুনান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ১/৪০)

হাফিয আবু ইয়াল্লা (রহঃ) মাসরুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) একদা মাসজিদে নাবতীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন : ‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচরবর্গ তো চারশ দিরহামের বেশি মোহর প্রদান করেননি। এটা (অধিক মোহর প্রদান করা) যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া এবং দানশীলতার কাজ বলে বিবেচনা কর তাহলে তোমরা তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারনা। সাবধান! আজ হতে আমি যেন শুনতে না পাই যে, কেহ চারশ’ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করেছে।’ এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসেন। তখন একজন কুরাইশ রমণী সম্মুখে এসে তাঁকে বলেন : ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! আপনি কি জনগণকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন?’ তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন মহিলাটি বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা যে কালাম অবতীর্ণ করেছেন তা কি আপনি শুনেননি?’ তিনি বলেন, ‘ঐ কালাম কি?’ মহিলাটি বলেন, ‘শুনুন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَتَيْتُمُ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا

এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক। (সূরা নিসা, ৪ : ২০) উমার (রাঃ) তখন বলেন : ‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমার হতে তো প্রত্যেকেই বেশি জানে।’ অতঃপর তিনি ফিরে যান এবং তৎক্ষণাৎ মিম্বরের উপর উঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন : ‘হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি যে, যে কোন লোক তার সম্পদ হতে ইচ্ছা মত মোহর নির্ধারণ করতে পারে।’ (আবু দাউদ ২/৫৮২, তিরমিযী ৪/২৫৫, নাসাঈ ৬/১১৭, ইব্ন মাজাহ ১/৬০১) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ তোমাদের স্ত্রীদেরকে প্রদত্ত মোহর তোমরা কিরূপে ফিরিয়ে নিবে? অথচ তোমরা তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছ, প্রয়োজন মিটিয়েছ, তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঐ হাদীসে রয়েছে যাতে একটি লোকের তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ পেশ করার কথা বর্ণিত আছে। তাদের উভয়ের শপথ গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন :

‘তোমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ তা‘আলা ভালভাবেই জানেন। তোমাদের মধ্যে কেহ এখনও তাওবাহ করেছ কি?’ তিনি এ কথা তিনবার বলেন। তখন পুরুষ লোকটি বলে, ‘তার মোহর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন : ‘ওর বিনিময়েই তো সে তোমার জন্য বৈধ হয়েছিল। এখন যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে তো এটা আরও বহু দূরের কথা।’ (ফাতহুল বারী ৯/৩৬৬, মুসলিম ২/১১৩১)

মোট কথা, আয়াতের ভাবার্থ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়েই গেছে। সুতরাং এখন মোহর ফিরিয়ে নেয়ার কোন অর্থ থাকেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا বিবাহ বন্ধন হচ্ছে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যার মধ্যে তোমরা আবদ্ধ হয়েছ। তোমরা মহান আল্লাহর এ নির্দেশ শুনেছ : ‘তোমরা তাদেরকে বন্ধনে রাখলে ভালভাবে রাখ, আর পরিত্যাগ করলে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ কর।

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন : তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদয় থাকবে, কারণ তোমরা তাদের সাথে আল্লাহর নামে চুক্তিবদ্ধ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে সহবাস করার অধিকার লাভ করেছ। (মুসলিম ২/৮৮৯)

পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা নিষেধ

(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা। এরপর আল্লাহ

তা'আলা বিমাতাকে বিয়ে করার অবৈধতা বর্ণনা করে তার সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করেছেন। এমন কি বাপ হয়তো শুধু বিয়েই করেছে, এখনও মা পিত্রালয় হতে বিদায় হয়েও আসেনি। এমনতাবস্থায় তার তালাক হয়ে গেল বা পিতা মারা গেল তথাপিও ঐ স্ত্রী তার ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে। এর উপর ঐক্যমত রয়েছে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে আত্মীয়কে (বিয়ে করা) আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন তাদেরকে অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও হারাম বলে জানত। শুধুমাত্র বিমাতা ও দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করাকে তারা হালাল মনে করত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমে এদেরকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। 'আতা (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ৮/১৩২-১৩৪)

যা হোক, এ ব্যাপারটি এ উম্মাতের উপর সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এমনকি আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা। অন্যত্র ঘোষিত হচ্ছে :

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫১)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৩২) এখানে ওর চেয়েও বেশি বলেছেন যে, এটা অরুচিকরও বটে। অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। এর ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এটা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করে সে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি শত্রুতাই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীগণকে মু'মিনদের মা রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং উম্মাতের উপর মায়েদের মতই তাঁদেরকেও হারাম করা হয়েছে। কেননা তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী, আর তিনি স্বীয় উম্মাতের পিতার মতই। এমনকি ইজমা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁর হক বাপ দাদার হকের চেয়েও বেশী। বরং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে জীবনের প্রতি ভালবাসার উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে।

এও বলা হয়েছে যে, এ কাজ আল্লাহ তা‘আলার অসন্তুষ্টির কারণ এবং অতি নিকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং যে এ কাজ করে সে ধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য। কাজেই তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সম্পদ ‘ফাই’ হিসাবে বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেন, বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বলেছেন যে, তার চাচাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রেরণ করেন যে তার সৎ মাকে বিয়ে করেছিল। (আহমাদ ৪/২৯০, আবু দাউদ ৪/৬০৯, তিরমিযী ৪/৫৯৮, নাসাঈ ৪/২৯৬, ইব্ন মাজাহ ২/৮৬৯)

২৩। তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুধী ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছে সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ত্রোণে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ; এবং যা অতীত হয়ে গেছে, তদ্ব্যতীত দুই

২৩. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنْ
الْرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

ভগ্নিকে একত্রে বিয়ে করা;
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল,
করুণাময়।

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

যাদেরকে কখনো বিয়ে করা যাবেনা

বংশজাত, দুগ্ধ পান সম্বন্ধীয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেসব মহিলাকে যে সমস্ত পুরুষ কখনই বিয়ে করার অধিকারী হবেনা অর্থাৎ হারাম করা হয়েছে এ আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাত প্রকারের নারী রক্ত সম্পর্কের কারণে এবং সাত প্রকারের নারী বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ৮/১৪২) ভগ্নি কন্যাগণ পর্যন্ত তো হচ্ছে বংশজাত আত্মীয়। এরপর বলা হচ্ছে :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنْ

الرِّضَاعَةِ তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ তোমাদের জন্য হারাম।' ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং মুসলিম (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘জন্ম যাকে হারাম করে, স্তন্যপানও তাকে হারাম করে।’ সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘বংশের কারণে যে হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও সে হারাম।’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৩, মুসলিম ২/১০৬৮)

বুকের দুধ পানকারীদের একের সাথে অন্যের বিয়ে হবেনা

আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দশবার দুধ পানের উপর অবৈধতার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। পরে ওটা রহিত হয়ে পাঁচবারের উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত ওটা পঠিত হতে থাকে। (মুসলিম ২/১০৭৫) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সালহা বিনতে সাহীলের (রাঃ) বর্ণনাটি। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আবু হুযাইফার (রাঃ) গোলাম সালিমকে (রাঃ) পাঁচবার দুধপান করিয়ে দেন। (আবু দাউদ ২/৫৫০)

তবে এটা স্মরণীয় বিষয় যে, বিজ্ঞজনের মতে এ দুধপান শিশুর দুধ ছেড়ে দেয়ার পূর্বে অর্থাৎ দু’বছরের মধ্যেই হতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারাহর (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৩) এর তাফসীরের মধ্যে দেয়া হয়েছে।

শাশুড়ীকে এবং স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে বিয়ে করা নিষেধ

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন : ‘শাশুড়ী হারাম।’ যে মেয়ের সাথে বিয়ে হবে, এ বিবাহ বন্ধনের সাথে সাথেই তার মা হারাম হয়ে যাবে, মেয়ের স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক। তবে হ্যাঁ, যে নারীকে বিয়ে করছে তার সাথে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা রয়েছে। এখন যদি বিয়ের পর ঐ মহিলাটির স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে থাকে তাহলে তার মেয়েটি তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে।

আর যদি সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার কন্যা তার স্বামীর জন্য হারাম হবেনা। এজন্যই এ আয়াতে এ শর্ত লাগানো হয়েছে। কোন কোন লোক هُنَّ সর্বনামটিকে শাশুড়ী ও প্রতিপালিতা মেয়ে উভয়ের দিকেই ফিরিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, শাশুড়ীও ঐ সময় হারাম হয় যখন তার মেয়ের সঙ্গে তার জামাতার নির্জনবাস হয়, নচেৎ হারাম হয়না। শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রীর মাতাও হারাম হয়না এবং স্ত্রীর মেয়েও হারাম হয়না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই।

দ্বীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে লালন-পালন না করলেও বিয়ে করা যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ... **وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ** তোমাদের প্রতিপালিতা ঐ মেয়েরা তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের ক্রোড়ে (অভিভাবকত্বে) অবস্থিতা, যদি তাদের মাতাদের সঙ্গে তোমাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে। বিজ্ঞজনদের ঘোষণা এই যে, তারা ক্রোড়ে (অভিভাবকত্বে) লালিতা পালিতা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থায়ই হারাম হবে। যেহেতু এরূপ মেয়েরা সাধারণতঃ তাদের মায়ের সাথেই থাকে এবং স্বীয় বৈপিত্রের (সৎ বাপের) নিকট প্রতিপালিতা হয় সেহেতু এ কথা বলা হয়েছে। এটা কোন শর্ত নয়। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে :

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْزَدْنَ مُحْصَنَاتًا

তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা। (সূরা নূর. ২৪ : ৩৩) এখানেও ‘যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে’ এ শর্তটি ঘটনার প্রাধান্য হিসাবে করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমার বোন আবু সুফইয়ানের মেয়ে ইয়্যাহুকে বিয়ে করুন।’ তিনি বলেন : ‘তুমি এটা পছন্দ কর?’ উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন ‘হ্যাঁ, আমি আপনাকে শূন্য রাখতে পারিনা। তাছাড়া এ সৎ কাজে আমি আমার বোনকেও জড়িয়ে দিবনা কেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘জেনে রেখ যে, এটা আমার জন্য বৈধ নয়।’ উম্মুল মু‘মিনীন উম্মে হাবীবা (রাঃ) তখন বলেন : ‘আমি তো শুনেছি যে, আপনি নাকি আবু সালমাহর (রাঃ) মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘উম্মে সালমাহর (রাঃ) গর্ভের মেয়েটির কথা বলছ?’ তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘জেনে রেখ, প্রথমতঃ সে আমার জন্য এ কারণে হারাম যে, সে আমার প্রতিপালিতা, সে আমারই ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ যদি এরূপ না হত তবুও সে আমার উপর হারামই হত। কেননা সে

আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবু সালমাহকে (রাঃ) সাওয়াইবাহ দুধ পান করিয়েছিলেন। সাবধান! তোমাদের কন্যা ও বোনদেরকে আমার উপর পেশ করনা।' (ফাতহুল বারী ৯/৬৪, মুসলিম ২/১০৭৩)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে : 'উম্মে সালমাহর (রাঃ) সাথে আমার বিয়ে যদি নাও হত তথাপিও সে আমার জন্য হালাল হতনা।' (ফাতহুল বারী ৯/৬২) সুতরাং অবৈধতার মূল তিনি বিয়েকেই সাব্যস্ত করেছেন।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, دَخَلْتُمْ بِهِنَّ এর ভাবার্থ হচ্ছে 'নারীদেরকে বিয়ে করা।' 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তাদের কাপড় সরিয়ে দেয়া, স্পর্শ করা এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে বসে পড়া।' ইবন যুরাইজ জিজ্ঞেস করেন, 'যদি এ কাজ স্ত্রীর বাড়ীতেই হয়?' 'আতা (রহঃ) উত্তরে বলেন, 'এখানকার ওখানকার দু'টোর হুকুম একই। এরূপ যদি হয়ে যায় তাহলে তার মেয়ে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে।'

ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) বলেন যে, শুধু নির্জনবাসের দ্বারাই তার মেয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয়না। যদি সঙ্গম করা, স্পর্শ করা এবং কামপ্রবৃত্তির সাথে তার কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীর মেয়ে তার উপর হারাম হবেনা।

পুত্রবধুরা তাদের স্বশুভ্রদের জন্য হারাম

এরপর বলা হচ্ছে : وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ তোমাদের পুত্রবধুগণও তোমাদের উপর হারাম, যারা তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের পত্নী। অর্থাৎ পালক পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

অতঃপর যায়িদ যখন তার (যায়নাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৭)

‘আতা (রহঃ) বলেন, ‘আমরা শুনতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদের (রাঃ) স্ত্রী যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন মাক্কার কুরাইশরা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দেয়। তখন নিম্নের

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪) এ আয়াতটি এবং

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪০) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/১৪৯)

হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতগুলি অস্পষ্ট, যেমন তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ, তোমাদের শাশুড়ীগণ। তাউস (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং মাকহুল (রহঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। আমি বলি অস্পষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সবাই এর মধ্যে জড়িত। শুধু বিয়ে করার পরেই অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, সঙ্গম হোক আর নাই হোক। এ মাসআলার উপর সবাই একমত যে, কেহ যদি প্রশ্ন করে, ‘আয়াতে তো শুধু ঔরসজাত পুত্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহলে দুধ পুত্রের স্ত্রী অবৈধ হওয়া কিরূপে সাব্যস্ত হবে।’ তাহলে এর উত্তর হবে এই যে, ওর অবৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বলেন : ‘স্তন্যপান দ্বারা ওটাই হারাম হয় যা হারাম হয় বংশের দ্বারা।’ (মুসলিম ২/১০৭২) জমহুরের মাযহাব এটাই যে, দুধ পুত্রের স্ত্রীও হারাম, যদিও তাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই।

দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

بِوَاكِهَةٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ বিবাহে দু’ বোনকে একত্রিত করাও তোমাদের জন্য হারাম। অধীনস্থ দাসীদের উপরও এ হুকুম প্রযোজ্য যে, একই সময় দু’ বোনের সাথে সঙ্গম করা হারাম। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে যা হয়ে গেছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম।’ সুতরাং জানা গেল যে, আগামীতে কোন সময় এ কাজ কারও জন্য বৈধ নয়।

সাহাবা, তাবেঈন, ঈমামগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের ইজমা আছে যে, একই সাথে দু' বোনকে বিয়ে করা হারাম। যে ব্যক্তি মুসলিম হবে এবং তার বিয়েতে দু'বোন থাকবে, তাকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, সে যে কোন একজনকে রাখবে অপরজনকে তালাক দিবে। আর এটা তাকে করতেই হবে। যাহহাক ইব্ন ফাইরুয (রাঃ) বলেন, তার পিতা বলেছেন : 'আমি যখন মুসলিম হই তখন আমার দু' স্ত্রী ছিল যারা পরস্পর বোন ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাদের একজনকে তালাক দেই'। (আহমাদ ৪/২৩২)

চতুর্থ পারা সমাপ্ত।

২৪। এবং নারীদের মধ্যে বিবাহিতাগণ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারী - আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে অন্যান্য নারীদের; তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান কর; অনন্তর তাদের দ্বারা যে ফল ভোগ করবে তজ্জন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবেনা যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

২৪. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

যুদ্ধে অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া বিবাহিতা মহিলা বিয়ে করা হারাম

আল্লাহ বলেন : **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** যেসব নারীর স্বামী রয়েছে তারাও তোমাদের জন্য হারাম। তবে হ্যাঁ, কাফিরদের যেসব স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিণী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা তোমাদের জন্য বৈধ হবে। মুসনাদ আহমাদে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আওতাসের যুদ্ধে কিছু বিবাহিতা মহিলা বন্দিণী হয়ে আসে। আমরা তাদের সাথে এ জন্য সহবাস করা পছন্দ করিনি যে, তাদেরতো স্বামী রয়েছে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়’। (আহমাদ ৩/৭২, তিরমিযী ৪/২৮২, নাসাঈ ৩/৩০৮, তাবারী ৮/১৫৩, মুসলিম ২/১০৮০) তাবরানীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এটা খাইবারের যুদ্ধের ঘটনা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ এ নির্দেশ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর লিখে দিয়েছেন, অর্থাৎ চারটি বিয়ের হুকুম। সুতরাং এটাই তোমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়, তোমরা ওর সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। তোমরা তাঁর শারীয়াত ও ফার্স্বগুলি মেনে চল।

বর্ণিত মহিলাগণ ছাড়া অন্যদের বিয়ে করা যাবে

এরপরে বলা হচ্ছে : **وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ** যে সব নারীর হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করা হল, তারা ছাড়া সমস্ত নারী তোমাদের জন্য হালাল। এটাই ‘আতা (রহঃ) এবং অন্যান্যদের উক্তি। (তাবারী ৮/১৭২) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ তোমরা এ হালাল নারীদেরকে স্বীয় সম্পদ দ্বারা গ্রহণ কর। আযাদ নারীদেরকে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে এবং দাসীদেরকে সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই বিয়ে করতে

পারবে, তবে শারীয়াতের পন্থায় হতে হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, **مُحْصِنِينَ** ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবদ্ধ করার জন্য। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً যেসব স্ত্রী হতে তোমরা ফল ভোগ কর, সে ফল ভোগের বিনিময়ে তাদেরকে মোহর প্রদান কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ

এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট গমন করেছিলে। (সূরা নিসা, ৪ : ২১) অন্যত্র রয়েছে :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ حِلَّةً

আর সম্ভ্রষ্ট চিঙে নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর। (সূরা নিসা, ৪ : ৪) অন্য স্থানে রয়েছে :

وَلَا حِلَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জাযিয় নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৯) এ আয়াত দ্বারা ‘মুত্আ’ বিয়ের উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

মু'তা বিয়ে বৈধ নয়

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ** ‘মু'তা’ বিয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ‘মু'তা’ শারীয়াতেরই বিধান ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়। মু'তা বিয়ে হল ঐ বিয়ে যা অস্থায়ী বা সাময়িক, পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই আপনা আপনি ভেঙ্গে যায়। কোন বস্তুর বিনিময়ে কোনরূপ ফল ভোগ করলে তাকে ‘মুত্আ’ বলে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এর উত্তম মীমাংসা করেছে যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধে মু'তা' বিয়ে এবং পালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৯/৫৯০, মুসলিম ২/১০২৭) এ হাদীসের শব্দগুলি আহকামের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সহীহ মুসলিমে সুবরা' ইব্ন মা'বাদ জুহ্নী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

‘হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে মুতআ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম। জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত পর্যন্ত ওটাকে হারাম করে দিয়েছেন। যার নিকট এ প্রকারের স্ত্রী রয়েছে সে যেন তাকে পরিত্যাগ করে এবং তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছ তা হতে কিছুই গ্রহণ করনা।’ (মুসলিম ২/১০২৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ মোহর নির্ধারণের পর যদি তোমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে কিছু মীমাংসা করে নাও তাহলে কোন অপরাধ হবেনা'। বলা হয়েছে :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً মোহর সহজভাবে ও খুশি মনে দিয়ে দাও। (৪ : ৪) তবে মোহর নির্ধারিত হবার পর যদি স্ত্রী তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয় তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর কারও কোন পাপ নেই।' হাযরামী (রহঃ) বলেন, ‘মানুষ মোহর নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর তার দরিদ্র হয়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা বৈধ।' ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ উজ্জিকৈই পছন্দ করেছেন। এরপর বলা হচ্ছে :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়'। এর বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে নিপুণতা ও যুক্তিযুক্ততা রয়েছে তা তিনিই খুব ভাল জানেন।

২৫। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম রমণীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী - সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে

۲۵. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ

কর। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্রুত। অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপপতি গ্রহণকারিণী হবেনা। অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা দুস্কার্যকে ভয় করে। এবং যদি বিরত থাক তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ
أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম দাসীকে বিয়ে করা উচিত

যারা স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেনা এখানে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। রাবীআ’ (রহঃ) বলেন যে, طُولُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আর্থিক সচ্ছলতা। فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ তাহলে তোমাদের ডান হাত অধিকারী সেই বিশ্বাসিনীকে বিয়ে কর। অর্থাৎ দাসীকে বিয়ে করবে যখন তার আর্থিক সচ্ছলতা থাকবেনা।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ সমস্ত কাজের যথার্থতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকটে প্রকাশমান। মানুষ তো শুধু বাহ্যিকটাই দেখে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্বাধীন ও দাস সবাই ঈমানী সম্পর্কের দিক দিয়ে একই। দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর’। জানা যাচ্ছে যে, দাসীদের অভিভাবক হচ্ছে তাদের মনিবগণ। তাদের অনুমতি ছাড়া দাসীদের বিবাহ সাধিত হয়না। অনুরূপভাবে দাসেরাও তাদের মনিবদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করতে পারেনা। হাদীসে রয়েছে : ‘যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে সে ব্যভিচারী।’ (আবু দাউদ ২/৫৬৩) তবে যদি কোন দাসীর অধিকারিণী কোন মহিলা হয় তাহলে তার অনুমতিক্রমে ঐ দাসীর বিয়ে ঐ ব্যক্তি দিয়ে দিবে যে স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারে। কেননা হাদীসে রয়েছে : ‘কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর বিয়ে না দেয়, কোন নারী যেন নিজের বিয়ে নিজে না দেয়, ঐ নারীরা ব্যভিচারিণী যারা নিজেরা নিজেদের বিয়ে দেয়।’ (ইব্ন মাজাহ ১/৬০৬) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ স্ত্রীদের মোহর সম্ভ্রষ্ট চিন্তে দিয়ে দাও। তারা দাসী বলে তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্ধারিত মোহর হতে কিছুই কম করনা। অতঃপর বলা হচ্ছে :

مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ তোমরা লক্ষ্য রেখ যে, নারীরা যেন নির্লজ্জতার কাজে আসক্তা না হয়, না তারা এমন হয় যে, কেহ যদি তাদের প্রতি আসক্ত হয় তাহলে তারাও তাদের প্রতি আসক্তা হয়ে পড়ে, না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হয়, না গোপনে পুরুষ বন্ধু খুঁজে বেড়ায়।’ যাদের মধ্যে এরূপ জঘন্য আচরণ রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করতে আল্লাহ তা‘আলা চরমভাবে নিষেধ করেছেন। বলা

হয়েছে ‘গাইরা মুসাফিহাত’ হল ঐ ঘৃণিত মহিলা যাদেরকে ব্যভিচারের জন্য ডাকা হলে তা থেকে তারা বিরত থাকেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ‘গাইরা মুসাফিহাত’ হল ঐ সমস্ত মেয়েলোক যাদেরকে ডাকা হলে যে কোন লোকের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে আপত্তি করেনা। আর وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ হল ঐ সমস্ত মহিলা যাদের পুরুষ বন্ধু রয়েছে। (তাবারী ৮/১৯৩) আবু হুরাইরাহ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা’বি (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৮/১৯৪)

দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তি হল
স্বাধীনা অবিবাহিতা মহিলার অর্ধেক

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى** অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা **الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ** ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক। ইহা দাসীদের বিয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যেমনটি নীচের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হবে :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি
স্বাধীনা ও মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের ডান
হাত যার অধিকারী, সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে কর।

বলা হচ্ছে, উপরোক্ত শর্তগুলির বিদ্যমানতায় দাসীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হল ঐ লোকদেরকে যাদের ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় রয়েছে এবং স্ত্রী মিলনের উপর ধৈর্যধারণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য অবশ্যই পবিত্র দাসীদের সাথে বিয়ে বৈধ।’ সেই সময়েও কিন্তু ধৈর্যধারণ করে দাসীদেরকে বিয়ে না করাই উত্তম। কেননা তাদের গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তারা তাদের মনিবের দাসী বা দাস হবে। তবে হ্যাঁ, যদি তাদের স্বামী দরিদ্র হয় তাহলে ইমাম শাফিঈর (রহঃ) প্রাচীন উক্তি অনুযায়ী এ সন্তানগুলির অধিকারী তাদের মনিব হবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন :

مُحْسِنِينَ وَإِنْ تَصِرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্য সবকিছু পরিস্কার বর্ণনা করতে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

٢٦. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

২৭। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও।

٢٧. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

২৮। আল্লাহ তোমাদের বোঝা লঘু করতে চান যেহেতু মানুষ দুর্বল (রূপে) সৃষ্ট হয়েছে।

٢٨. يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخَفَّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

কুরআন ঘোষণা করছে, ‘হে মু’মিনগণ! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হালাল ও হারাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান, যেমন এ সূরায় এবং অন্যান্য সূরাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের

প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তাঁর শারীয়াতের উপর আমল করতে থাক যে কাজ তাঁর নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তোমাদের তাওবাহ কবুল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায কাজ হতে তোমরা তাওবাহ করে থাক সে তাওবাহ তিনি সত্বর কবুল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়। স্বীয় শারীয়াতে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কাজে ও স্বীয় ঘোষণায় তিনি সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণ নিপুণতার অধিকারী।

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا প্রবৃত্তি পূজারীরা অর্থাৎ শাইতানের দাস ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা এবং অসৎ লোকেরা তোমাদের পদস্থলন ঘটিয়ে তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায ও অসত্যের পথে চালাতে চায়।

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ আল্লাহ তা'আলা শারীয়াতের আহকাম নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের পথ সহজ করতে চান এবং এর উপর ভিত্তি করেই কতগুলি শর্ত আরোপ করে দাসীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন। মানুষ জন্মগতভাবেই দুর্বল বলে মহান আল্লাহ স্বীয় আহকামের মধ্যে কোন কাঠিন্য রাখেননি। وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল বলে তার আকাজক্ষা ও প্রবৃত্তি দুর্বল। তারা স্ত্রীদের ব্যাপারে দুর্বল। তারা এখানে এসে একেবারে বোকা বনে যায়।

২৯। হে মু'মিনগণ!
তোমরা অন্যাযভাবে
পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস
করনা; কেবল মাত্র পরস্পর
সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর
তা বৈধ এবং তোমরা
নিজেদের হত্যা করনা;
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের
প্রতি ক্ষমাশীল।

۲۹. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

	بِكُمْ رَحِيمًا
৩০। আর যে কেহ সীমা অতিক্রম করে অথবা যুল্মের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব এবং আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ সাধ্য।	۳۰. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
৩১। তোমরা যদি সেই মহাপাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব।	۳۱. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

অবৈধ আয় করা থেকে বিরত থাকার আদেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে নিষেধ করছেন। সেই উপার্জনের দ্বারাই হোক যা শারীয়াতে হারাম, যেমন সুদ খাওয়া, জুয়া খেলা অথবা এরকমই প্রত্যেক প্রকারের কৌশলের দ্বারাই হোক, যদিও এটাকে কেহ কেহ বৈধ মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন। ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় : একটি লোক কাপড় ক্রয় করছে এবং বলছে, 'আমার যদি পছন্দ হয় তাহলে রেখে দিব, নচেৎ কাপড় এবং একটি দিরহাম ফিরিয়ে দিব' এর হুকুম কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি

পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২১৭) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াত **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ** নাযিল করেন তখন কিছু মুসলিম বলতে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের মায়ের সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে আহার করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের খাদ্যই হল উত্তম সম্পদ। অতএব আমাদের করোরই অন্য কারও খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা নাযিল করেন :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاحِهِمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম

করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা নূর. ২৪ : ৬১) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আল্লাহ বলেন :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ। তিজারাতান শব্দটিকে তিজারাতুনও পড়া হয়েছে। এটি اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ। যেমন বলা হচ্ছে, ‘অবৈধযুক্ত কারণসমূহ দ্বারা সম্পদ জমা করনা।’ কিন্তু শারীয়াতের পন্থায় ব্যবসা দ্বারা লাভ করা বৈধ, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় হোক অথবা দান হোক, সব কিছুই এ হুকুম রয়েছে। (তাবারী ৮/২২১)

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ঘটানো স্থল তাগ করার পর রহিত করা যাবেনা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার রয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৪/৩৮৫, মুসলিম ৩/১১৬৩) ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে : যখন দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে লেন-দেন করে (তা পরিবর্তন করার ব্যাপারে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা তা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। (ফাতহুল বারী ৪/৩৯০)

হত্যা করা এবং আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে

এরপর বলা হচ্ছে : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারিত হারাম কাজগুলো করে এবং তাঁর অবাধ্য হয়ে, আর অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা। إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ দয়ালু পরিপূর্ণ।’

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ইবনুল আসকে (রাঃ) ‘যাতুস্ সালাসিলের’ যুদ্ধের বছর প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, একদা কঠিন শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়, এমনকি গোসল

করতে আমি আমার জীবনের উপর হুমকি মনে করি। সুতরাং আমি তায়াম্মুম করে আমার জামাতাকে ফাজরের সালাত আদায় করিয়ে দিই। অতঃপর ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই। তাঁর নিকট আমি আমার এ ঘটনাটি বর্ণনা করি। তিনি বলেন : ‘তুমি কি তাহলে অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছ?’ আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কঠিন ঠাণ্ডা ছিল এবং আমার প্রাণের ভয় ছিল। অতঃপর আমার মনে পড়ে গেল যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন এবং আমাকে কিছুই বলেননি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরাই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করায় আমার ইব্নুল আস (রাঃ) এ ওয়র পেশ করেছিলেন।

ইব্ন মারদুআই (রহঃ) এ আয়াতটির ব্যাপারে বলেন যে, আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লৌহ শলাকা দ্বারা নিজকে হত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে ঐ লৌহ শলাকা হাতে নিয়ে তা দ্বারা নিজকে আঘাত করতেই থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে নিজকে হত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে ঐ বিষের পাত্র হাতে নিয়ে বিষ পান করতেই থাকবে। যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে ঝাপিয়ে পড়তেই থাকবে। (ফাতহুল বারী, মুসলিম)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে : ‘যে নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।’ এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন :

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا
সীমা অতিক্রম করে এ কাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরত্বপূর্ণা দেখিয়ে ঐ কাজ করবে, সে জাহান্নামী হবে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এ কঠিন ভীতির ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা‘আলার এ নির্দেশ শুনে হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত।

বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট পাপ ক্ষমা হতে পারে

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُوا** তোমরা যদি বড় বড় পাপ হতে বেঁচে

থাক তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

মুসনাদ আহমাদে সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : জুমু‘আর দিন কি, তা তুমি জান কি? আমি উত্তরে বললাম : ওটা ঐ দিন যে দিন আল্লাহ তা‘আলা আমাদের পিতা আদমের (আঃ) সৃষ্টি জমা করেন। তিনি বললেন : আমি জানি জুমু‘আর কি ফাযীলাত রয়েছে! যে ব্যক্তি এ দিন ভালভাবে পবিত্রতা লাভ করে জুমু‘আর সালাতের জন্য আগমন করে এবং সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করে, তার সে কাজ পরবর্তী জুমু‘আ পর্যন্ত সমস্ত পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হত্যা হতে বেঁচে থাকে। ইমাম বুখারীও (রহঃ) সালমান ফারসীর (রাঃ) বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে নিম্নরূপ বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ধ্বংসকারী সাতটি পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাক।’ জিজ্ঞেস করা হয়, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐপাপগুলো কি?’ তিনি বলেন : ‘(১) আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা। (২) যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ তাকে হত্যা করা, তবে শারীয়াতের কোন কারণে যদি তার রক্ত হালাল হয় সেটা অন্য কথা। (৩) যাদু করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) পিতৃহীনের সম্পদ ভক্ষণ করা। (৬) কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা। (৭) সতীসাপ্তী মুসলিম নারীদেরকে অপবাদ দেয়া।’ (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন অথবা তাঁকে কেহ বড় পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তখন তিনি বলেন : উহা হল ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে অংশী করা, আত্মহত্যা করা এবং মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন না করা। অতঃপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দিব? তা হল মিথ্যা বর্ণনা করা অথবা মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী শু‘বাহ (রাঃ) বলেন : আমার মনে হয় খুব সম্ভব তিনি ‘মিথ্যা সাক্ষী’র কথাই বলেছেন। (আহমাদ ৩/১৩১, ফাতহুল বারী ১০/৪১৯, মুসলিম ১/৯১))

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুর রাহমান ইব্ন আবী বাকরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে বড় পাপের (কাবীরা গুনাহ) মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি তা বলে দিব? আমরা বললাম : হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন : ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন না করা। অতঃপর তিনি হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : আমি তোমাদেরকে মিথ্যা কথন এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা তিনি বার বার বলছিলেন এবং আমরা মনে মনে বলছিলাম, তিনি যদি থামতেন! (ফাতহুল বারী ৫/৩০৯, মুসলিম ১/৯১)

সন্তানদের হত্যা না করার ব্যাপারে আর একটি হাদীস

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি? তিনি বললেন : ‘তা এই যে, তুমি অন্য কেহকে আল্লাহর অংশীদার কর, অথচ একমাত্র তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার পরে কোন্টি? তিনি বললেন : ‘তার পরে এই যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তুমি তাকে হত্যা করে ফেল।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : ‘তারপরে এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়।’ (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আয়াতগুলি পাঠ করেন।

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ
لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮-৭০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সবচেয়ে বড় পাপসমূহ হল আল্লাহর সাথে ইবাদাতে অন্যকে শরীক করা, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন না করা এবং আত্মহত্যা করা। শু’বাহ (রহঃ) বলেন যে, ‘এবং মিথ্যা শপথ করা’ বলেছিলেন কিনা তা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। (বুখারী ৬৬৭৫, তিরমিযী ৩০২১, নাসাঈ ৮/৬৩)

মা-বাবাকে গালি দেয়া বড় পাপ

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মানুষের তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়াও কাবীর পাপ।’ জনগণ জিজ্ঞেস করল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ তার পিতা-মাতাকে কিরূপে গালি দিবে?’ তিনি বললেন : ‘এভাবে যে, সে অন্যের বাপকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার বাপকে গালি দেয়, সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার মাকে গালি দেয়।’ (মুসলিম ৯০)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মুসলিমকে গালি দেয়া মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করা হচ্ছে কুফরী।’ (বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৬৪)

৩২। এবং তোমরা ওর
আকাংখা করনা যদ্বারা
আল্লাহ একের উপর
অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান
করেছেন; পুরুষেরা যা
উপার্জন করেছে তাতে
তাদের অংশ রয়েছে এবং

৩২. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ
بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا

নারীরা যা উপার্জন করেছে
তাতে তাদের অংশ রয়েছে
এবং তোমরা আল্লাহরই
নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর,
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে
মহাজ্ঞানী।

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^৫
وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^৬ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অন্যের প্রাপ্য দেখে নিজের জন্য আফসোস না করা

উম্মে সালামাহ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পুরুষ লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে, আর আমরা নারীরা এ সাওয়াব হতে বঞ্চিত থাকি। অনুরূপভাবে মীরাসও আমরা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পেয়ে থাকি। সেই সময় **عَلَى بَعْضِكُمْ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৬/৩২২, তিরমিযী ৮/৩৭৫, ৩৭৭) এরপর বলা হয়েছে :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^৫
উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল কার্যের প্রতিদান ভাল এবং মন্দ কার্যের শাস্তি মন্দ হবে।

আল ওয়ালিবি (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যে অংশ পাবে তা পূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা কিভাবে উপকৃত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে অন্যদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু দেয়া হয়েছে তা তোমরা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়োনা। কারণ এটাতো আল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে এবং তোমাদের আকাংখা তা পরিবর্তন করতে পারেনা। বরং তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং আমি তোমাদের তা প্রদান করব। কারণ আমিই মহানুভব এবং মহান দাতা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ আমার নিকট আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা করতে থাক, পরস্পর একে অপরের ফাযীলাত চাওয়া অনর্থক হবে। তবে হ্যাঁ, আমার নিকট যদি আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা কর তাহলে আমি কৃপণ নই, বরং আমি দাতা, সুতরাং আমি দান করব এবং অনেক কিছুই দান করব।

৩৩। আমি সবাইকেই উত্তরাধিকারী করেছি যা তাদের মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে যায় এবং দক্ষিণ হস্ত যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।

۳۳. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ)। সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরা وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী। (তাবারী ৮/২৭০, ২৭১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ‘মাওয়ালী’ অর্থ হচ্ছে আত্মীয় স্বজন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন যে, আরাবরা তাদের চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইদেরকে বলেন ‘মাওলা’।

ইব্ন জারীর (রহঃ) مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, যা কিছু সে তার পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। অতএব এ আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে : হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য আত্মীয় স্বজন (যেমন সন্তান) নিযুক্ত করেছি, যারা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যেমনটি তোমরা তোমাদের মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকারী হয়েছ।

আর পরবর্তী বাক্যের (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَهُمْ) ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মুহাজিরগণ যখন মাদীনায়ে আগমন করেন তখন সেখানকার প্রথা অনুযায়ী তারা তাদের আনসার ভাইদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং আনসারগণের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের উত্তরাধিকারী হতেননা। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা উক্ত প্রথা রহিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য কর, তাদের উপকার কর এবং তাদের মঙ্গল কামনা কর। কিন্তু তারা তোমাদের মীরাস পাবেনা। তবে হ্যাঁ, তোমরা তাদের জন্য অসীয়াত করতে পার। (ফাতহুল বারী ৮/৯৬)

৩৪। পুরুষেরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণপোষণকারী, যেহেতু আব্বাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই হেতু যে, তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে; সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আব্বাহর সংরক্ষিত প্রাচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে। যদি নারীদের অবাধ্যতার আশংকা হয় তাহলে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর, তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর; অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের জন্য অন্য পস্থা অবলম্বন করনা; নিশ্চয়ই

৩৪. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

আল্লাহ সমুন্নত, মহা মহীয়ান।

كَبِيرًا

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর সংরক্ষক ও প্রতিপালনকারী। সে স্ত্রীকে সোজা ও সঠিকভাবে পরিচালনাকারী। কেননা بَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এ কারণেই নাবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শারীয়াতের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘ঐ সব লোক কখনও সাফল্য লাভ করতে পারেনা যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকত্রী বানিয়ে নেয়’। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের সম্পদ খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৮)

উত্তম স্ত্রীর বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রাচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে) ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর সম্পদের হিফাযাত করা ইত্যাদি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘উত্তম ঐ নারী যখন তার স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সম্ভ্রষ্ট করে, যখন কোন নির্দেশ দেয় তখন তা পালন করে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে নিজেকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে নিরাপদে রাখে ও স্বীয় স্বামীর সম্পদের হিফাযাত করে।’ অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২৯৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রামাযানের সিয়াম পালন করবে, স্বীয় গুণ্ডাগের হিফাযাত করবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, তাকে বলা হবে, যে কোন দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর।’ (আহমাদ ১/১৯১)

অবাধ্য স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ** যেসব নারীর দুষ্টমিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপর কু-প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয়না এবং তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে উপদেশ প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেরকে বল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যদি কেহকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ করবে তাহলে নারীকে নির্দেশ দিতাম, সে যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে। কেননা তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই রয়েছে।’ (তিরমিযী ৪/৩২৩)

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে তখন সকাল পর্যন্ত মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।’ (ফাতহুল বারী ৯/২০৫)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে রাতে কোন স্ত্রী রাগান্বিতা হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহর রাহমাতের মালাক/ফেরেশতা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।’ (মুসলিম ৩/১০৫৯) তাই এখানে ইরশাদ হচ্ছে :

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ এরূপ অবাধ্য নারীদেরকে প্রথমে বুঝাতে চেষ্টা কর অথবা বিছানা হতে পৃথক রাখ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘শয়ন তো বিছানার উপরেই করাবে, কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্তন করে থাকবে এবং সঙ্গম করবেনা। তার সাথে কথা বলাও বন্ধ রাখতে পার এবং স্ত্রীর জন্য এটাই হচ্ছে বড় শাস্তি।’ (তাবারী ৮/৩০২) কোন কোন তাফসীরকারকের মতে তাকে পার্শ্বে শয়ন করতেও দিবেনা। সুদী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আরও যোগ করেছেন ‘তার সাথে কথা বলবেনা অথবা তার কথার উত্তরও দিবেনা।’ (তাবারী ৮/৩০২-৩০৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় : ‘স্ত্রীর তার স্বামীর উপর কি হক রয়েছে?’ তিনি বললেন :

‘যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে, তার মুখে আঘাত করনা, গালি দিওনা, ঘর হতে পৃথক করনা, ক্রোধের সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বন্ধ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের করনা।’ (আবু দাউদ ২/৬০৬, নাসাই ৫/৩৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/৫৯৩, আহমাদ ৫/৩) অতঃপর বললেন : ‘তাতেও যদি ঠিক না হয় তাহলে তাকে শাসন-গর্জন করে এবং মৃদু প্রহার করে হলেও সরল পথে আন।’ সহীহ মুসলিমে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হাজ্জের ভাষণে রয়েছে :

‘নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, যাদের যাতায়াতে তোমরা অসম্মত তাদেরকে তারা আসতে দিবেনা। যদি তারা এরূপ না করে তাহলে তোমরা তাদেরকে উত্তমভাবে সতর্ক করতে পার। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তোমরা যুক্তি সঙ্গতভাবে তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে। (মুসলিম ৮/৮৮৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে হাল্কা প্রহার করা যাবে। (তাবারী ৮/৩১৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে কঠোর প্রহার করা যাবেনা। (তাবারী ৮/৩১৬)

স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হলে তাকে কোনভাবেই কষ্ট দেয়া যাবেনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا আল্লাহ তা‘আলা স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য পালন করতে বলেছেন তা যথাযথ পালন করা হলে কোনভাবেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যায় আচরণ করা বৈধ নয়। অতএব এ

ক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করা অথবা বিছানা ত্যাগ করতে বলার স্বামীর কোন অধিকার নেই।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا আল্লাহ সমুন্নত ও মহীয়ান। অর্থাৎ যদি নারীদের পক্ষ হতে দোষত্রুটি প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই বা দোষত্রুটি করার পর সংশোধিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে শাসন-গর্জন কর তাহলে জেনে রেখ যে, তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৩৫। আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর তাহলে তোমাদের বংশ হতে একজন বিচারক এবং তোমাদের স্ত্রীদের বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর; যদি তারা মীমাংসার আকাংখা করে তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ।

۳۵. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগ

ইতোপূর্বে ঐ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অবাধ্যতা ও বক্রতা যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়। আর এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করে তাহলে কি করতে হবে? এ ব্যাপারে উলামা-ই কিরাম বলেন যে, এরূপ অবস্থায় শাসনকর্তা একজন নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিচারক নিযুক্ত করবেন, যিনি দেখবেন যে, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি কার পক্ষ হতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি অত্যাচারীকে অত্যাচার হতে বাধা দান করবেন। যদি এর দ্বারা কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় তাহলে শাসনকর্তা স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন ও পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক

নির্ধারণ করবেন এবং তাঁরা দু'জন মিলিতভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন। অতঃপর যাতে তারা মঙ্গল বিবেচনা করবেন সে মীমাংসাই করবেন। অর্থাৎ হয় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করবেন, না হয় মিলন ঘটিয়ে দিবেন। তবে আল্লাহ চান যে, তাদের মাঝে সমঝোতা হোক। তাই তিনি বলেন, **إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا** যদি তারা মীমাংসার আকাংখা করে তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন যে, স্ত্রী এবং স্বামী উভয়ের পক্ষ থেকে একজন করে ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হবে যারা খুঁজে বের করবেন যে, ঐ যুগলের মাঝে কে অন্যায় আচরণকারী। যদি স্বামী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে স্ত্রীর কাছে যেতে দেয়া হবেনা এবং এ জন্য তাকে কিছু অর্থ প্রদান করতে হবে। আর যদি স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে তার স্বামীর কাছেই থাকতে হবে, তবে তাকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবেনা। মীমাংসাকারীগণ যদি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অথবা অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্ত দেন তাহলে তা অনুমোদিত হবে। এমনকি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তো বলেন যে, সালিশদ্বয় যদি তাদেরকে একত্রীকরণের ফাইসালা করেন এবং সে ফাইসালা একজন মেনে নেয় ও অপরজন না মানে আর ঐ অবস্থায়ই একজনের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে যে সম্মত ছিল সে অসম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যে অসম্মত ছিল সে সম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবেনা। (তাবারী ৮/৩২৫)

ইমাম আবু উমার ইব্ন বার (রহঃ) বলেন, এ কথার উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে যে, দু'জন সালিশের উক্তির মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে তখন বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে অপরের উক্তির উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হবেনা। তারা এ বিষয়ে একমত যে, যদি মীমাংসাকারীগণ কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তাহলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে তা মেনে নিতে বাধ্য; যদিও তারা মীমাংসাকারীগণকে তাদের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করেনি। এ কথার উপরও ইজমা হয়েছে যে, যদি সালিশদ্বয় সংযোগ স্থাপন করতে চান তাহলে তাদের ফাইসালা কার্যকর হবে। কিন্তু যদি তারা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করতে চান তাহলেও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে কিনা সেই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজনের মাযহাব এটাই যে, সে সময়েও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে যদিও তাদেরকে ওয়াকীল (উকিল) বানানো না হয়।

৩৬। এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা।

৩৬. وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং মা-বাবার বাধ্য থাকতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইবাদাতের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং স্বীয় একাত্মবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সৃষ্টিকর্তা, আহরদাতা, নি‘আমাত প্রদানকারী এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর সদা-সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দানের বৃষ্টি বর্ষণকারী একমাত্র তিনিই। অতএব তাঁর সৃষ্টিসমূহের কোন কিছুকে শরীক না করে এককভাবে ইবাদাত পাবার যোগ্যতা রাখেন একমাত্র তিনিই।

একবার মু‘আযকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : ‘বান্দাদের উপর আল্লাহর হুক কী তা জান কি?’ তিনি উত্তরে বলেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।’ তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘তা হচ্ছে এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করবেনা।’ অতঃপর তিনি বলেন : ‘বান্দা যখন এটা করবে তখন আল্লাহর জিম্মায় তাদের হক কী রয়েছে তা জান কি? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেননা।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৫৯)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমাদের রাব্ব আদেশ করছেন যে, তোমরা তাঁকে (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং তোমরা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে :

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَاكَ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪) অন্যত্র রয়েছে :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হুকুম দিচ্ছেন, ‘তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও ভাল ব্যবহার কর।’ যেমন হাদীসে এসেছে :

‘মিসকীনদের উপর সাদাকাহ শুধু সাদাকাই হয় এবং আত্মীয়দের উপর সাদাকাহ সাদাকাও হয় এবং সাথে সাথে আত্মীয়তার সংযোগ স্থাপনও হয়।’ (তিরমিযী ৩/৩২৪)

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে, ‘তোমরা পিতৃহীনদের সাথেও উত্তম ব্যবহার কর। কেননা তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের মাথায় স্নেহের হস্তচালনাকারী, তাদেরকে সোহাগকারী এবং স্নেহ ও আদরের সাথে তাদেরকে পানাহারকারী দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে।’

এরপর মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা তারা অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা মিসকীনদের অভাব দূর কর এবং তাদের কাজকর্ম করে দাও।’ ফকীর ও মিসকীনের পূর্ণ বর্ণনা সূরা বারআতে (সূরা তাওবাহ) ইনশাআল্লাহ আসবে।

প্রতিবেশীর হক

এবারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ** তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, তারা সম্পর্কীয় প্রতিবেশীই হোক, অথবা সম্পর্কবিহীনই হোক। ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) **وَالْجَارِ الْجُنُبِ** এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা প্রতিবেশী ও অনাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ৮/৩৩৫, ৩৩৬) প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হচ্ছে :

(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এত বেশি উপদেশ দেন যে, আমার ধারণা হয় তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।’ (আহমাদ ২/৮৫, ফাতহুল বারী ১০/৪৫৫, মুসলিম ৪/২০২৫)

(২) মুসনাদ আহমাদেই রয়েছে, আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট উত্তম সঙ্গী ঐ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে।’ (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

(৩) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা স্বীয় সাহাবীবর্গকে জিজ্ঞেস করেন : ‘ব্যভিচার সম্বন্ধে তোমরা কি বল?’ সাহাবীগণ বলেন, ওটা অবৈধ। আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত ওটা অবৈধই থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জেনে রেখ যে, দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কম পাপী যে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে।’ পুনরায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমরা

চুরি সম্বন্ধে কি বল? তাঁরা উত্তরে বলেন, ‘ওটাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করেছেন এবং ওটাও কিয়ামাত পর্যন্ত হারামই থাকবে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন : ‘জেনে রেখ যে, যে চোর দশ বাড়ীতে চুরি করেছে তার পাপ ঐ চোরের পাপ হতে হালকা, যে তার প্রতিবেশীর ঘর হতে কিছু চুরি করে।’ (আহমাদ ৬/৮)

(৪) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?’ তিনি বলেন : ‘তা এই যে, তুমি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করছ যে, সে তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : ‘তারপরে এই যে, তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও।’ ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

(৫) মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘আমার দুই প্রতিবেশী রয়েছে। আমি একজনের কাছে উপটোকন পাঠাতে চাই, তাহলে কার কাছে পাঠাব?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘যার দরজা নিকটে হবে।’ (আহমাদ ৬/১৭৫, বুখারী ৬০২০)

ভৃত্য ও অধীনস্তদের প্রতি সদয় হতে হবে

অতঃপর বলা হচ্ছে : وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সঙ্গেও সং ব্যবহার কর। কেননা ঐ গরীবেরা তো তোমাদের হাতে রয়েছে। তাদের উপর তো তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো স্বীয় মৃত্যুশয্যাও তাঁর উম্মাতকে এর জন্য অসীয়াত করে গেছেন। তিনি বলেন : ‘হে লোকসকল! সালাত ও দাসদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।’ (নাসাঈ ৪/২৫৮) বার বার তিনি এ কথা বলতেই থাকেন, অবশেষে তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তুমি নিজে যা খাও ওটা সাদাকাহ, যা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও

ওটাও সাদাকাহ, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ এবং যা তোমার পরিচারককে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ।’ (আহমাদ ৪/১৩১, নাসাঈ ৫/৩৭৬) এ হাদীসটির বর্ণনায় ধারাবাহিকতা রয়েছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) স্বীয় দেখাশুনাকারীকে বলেন, ‘গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছ কি?’ তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত দেইনি।’ তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : যাও, দিয়ে এসো। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মানুষের জন্য এ পাপই যথেষ্ট যে, সে যে আহার্যের মালিক তা সে আটকে রাখে।’ (মুসলিম ২/৬৯২)

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘অধীন্যস্ত গোলামের হক এই যে, তাকে খাওয়ানো, পান করানো ও পরানো হবে এবং তার দ্বারা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া হবেনা।’ (মুসলিম ৩/১২৮৪)

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন তোমাদের কারও পরিচারক তার খাদ্য নিয়ে আসে তখন তোমাদের উচিত যে, যদি পার্শ্বে বসিয়ে খাওয়াতে না পার তাহলে কমপক্ষে তাকে দু’ এক গ্রাস দিয়ে দিবে। তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে, রান্না করার গরম ও কষ্ট তাকেই ভোগ করতে হয়েছে।’ ফাতহুল বারী ৫/২১৪, মুসলিম ৩/১২৮৪)

আল্লাহ অবাধ্যকারীকে পছন্দ করেননা

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا : আল্লাহ তা‘আলা বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা। তারা নিজেদেরকে ভাল মনে করলেও আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলার নিকট তারা আদৌ ভাল নয়। তারা নিজেদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহ তা‘আলার নিকট তারা মূল্যহীন। জনগণের দৃষ্টিতেও তারা হয়ে ও তুচ্ছ। তারা কত বড় অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ যে, কারও উপর কিছু অনুগ্রহ করলে তাকে সেই অনুগ্রহের খোঁটা দেয়, কিন্তু তাদের প্রভুর যে নিআমাত তাদের উপর রয়েছে তার জন্য তারা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। মানুষের মধ্যে বসে তারা গর্ব করে বলে আমি এত বড় লোক, আমার এটা আছে, ওটা আছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াকিদ আবু রাজা হারভী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অহংকারী ও আত্মসত্ত্বী হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, ‘পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগ্য হয়ে থাকে।’ অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ جَبَّارًا شَقِيًّا

আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধৃত ও হতভাগ্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩২)

বানু হাজীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ‘আমাকে কিছু উপদেশ দিন।’ তিনি বললেন : ‘কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে (লটকিয়ে) পরিধান করনা। কেননা এটা হচ্ছে অহংকার ও আত্মসত্ত্বিতা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পছন্দ করেননা।’ (আহমাদ ৫/৬৪)

৩৭। যারা কুপণতা করে ও লোকদের কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুতঃ আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

۳۷. الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

৩৮। এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আর যাদের সহচর শাইতান

۳۸. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنْ

- সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে।	الْشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
৩৯। আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত - যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করত? এবং আল্লাহ তাদের বিষয়ে যথার্থই অবগত।	۳۹. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا

আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করার জন্য রয়েছে শাস্তি

ইরশাদ হচ্ছে : **الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ** যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ খরচ করতে কার্পণ্য করে, যেমন বাপ-মাকে প্রদান করতে এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীকে অভাবের সময় আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার কাজে কার্পণ্য করে, শুধু তাই নয় বরং লোকদেরকেও কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ না করার পরামর্শ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ আর কি হতে পারে?’ (আদাব আল মুফরাদ ৮৩) তিনি আরও বলেছেন : ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কার্পণ্য হতে বেঁচে থাক। এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণেই তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতা, অন্যায় ও দুষ্কার্য প্রকাশ পেয়েছিল।’ (আবু দাউদ ২/৩২৪) এরপর বলা হচ্ছে :

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ তারা এ দু'টি দুষ্কার্যের সাথে সাথে আরও একটি দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়। তা এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ গোপন করে, ঐগুলি প্রকাশ করেনা। ঐগুলি না তাদের খাওয়া পরায় প্রকাশ পায়, না আদান-প্রদানে প্রকাশিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ

মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী। (সূরা ‘আদিয়াত, ১০০ : ৬-৭) তার পরে বলেন :

وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন। (সূরা ‘আদিয়াত, ১০০ : ৮) এখানেও বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন করেছে। এরপর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। ‘কুফর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন করা এবং ঢেকে দেয়া। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার নি‘আমাতকে গোপন করে, ওর উপরে পর্দা নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ ঐ নি‘আমাতসমূহ অস্বীকার করে। হাদীসে রয়েছে : ‘আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন বান্দাকে স্বীয় নি‘আমাত দান করেন তখন চান যে, ওর চিহ্ন যেন তার উপরে প্রকাশ পায়।’ (তাবারানী কাবীর ১৮/১৩৫)

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের ঐ কার্পণ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে কার্পণ্য তারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী গোপন করার ব্যাপারে করত। এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের কার্পণ্যের ব্যাপারে হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পষ্টতঃ এখানে সম্পদের কৃপণতার কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে, যদিও ইলমের কৃপণতা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা ভুললে চলবে না যে, এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন ও দুর্বলদেরকে সম্পদ প্রদানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে লোকদেরকে দেখানোর জন্য সম্পদ প্রদানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ঐ কৃপণদের কথা যারা টাকা পয়সাকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখে। তার পরে বর্ণনা করা হয়েছে ঐ লোকদের যারা সম্পদ খরচ তো করে বটে, কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুনিয়ায় নাম-যশ কেনার জন্য। وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে।

হাদীসে রয়েছে : ‘যে তিন প্রকারের লোকের জন্য জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে, তারা হল রিয়াকার আলেম, রিয়াকার গায়ী এবং রিয়াকার ব্যয়কারী (দাতা)। ঐ দাতা বলবে, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেক রাস্তায় স্বীয় সম্পদ খরচ করেছিলাম।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার

ইচ্ছা তো শুধু এই ছিল যে, তুমি বড় দাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ কর। সুতরাং তা বলা হয়ে গেছে।’ অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ। তা আমি তোমাকে দুনিয়ায়ই দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তুমি তোমার উদ্দেশ্য লাভ করেছে। (নাসাঈ ৬/২৪) এ জন্য আল্লাহ বলেন :

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ

قَرِينًا এবং তারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা। শাইতান তাদেরকে খারাপ কাজ করতে নানাভাবে প্রলুদ্ধ করে, যদিও তাদের উচিত উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করা। অভিশপ্ত শাইতান খারাপ কাজকে শোভনীয় করে তাদেরকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে তোলে। এ জন্যই এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আল্লাহ ও কিয়ামাতের উপর তাদের বিশ্বাস নেই, নতুবা তারা শাইতানের ফাঁদে পড়তনা এবং খারাপকে ভাল মনে করতনা। তারা শাইতানের সঙ্গী। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ

তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে, সঠিক পথে চলতে, রিয়া পরিত্যাগ করতে এবং ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তাতে (ঈমান আনায়) তাদের কি ক্ষতি হচ্ছে? বরং সরাসরি উপকারই রয়েছে। কারণ এর ফলে তাদের পরিণাম ভাল হবে। তারা আল্লাহর পথে খরচ করতে সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করছে কেন? তারা আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা ও সম্ভৃষ্টি লাভের চেষ্টা করছে না কেন? আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তাদের ভাল ও মন্দ নিয়্যাতের জ্ঞান তাঁর পূরাপুরিই রয়েছে। ভাল কাজের তাওফীক লাভ করার যোগ্য ও অযোগ্য সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান। ভাল লোকদেরকে তিনি ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করে স্বীয় সম্ভৃষ্টির কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিয়ে তাদেরকে তাঁর নৈকট্য দান করে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকদেরকে তিনি স্বীয় মহা মর্যাদা সম্পন্ন দরবার হতে দূরে সরিয়ে দেন, যার ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যায়।’ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা আমাদেরকে ওটা হতে আশ্রয় দান করুন!

৪০। নিশ্চয়ই আল্লাহ
বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেননা
এবং যদি কেহ কোন সৎ

৬০. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

<p>কাজ করে থাকে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন।</p>	<p>وَأِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا</p>
<p>৪১। অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব?</p>	<p>٤١. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا</p>
<p>৪২। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে - যেন ভূমন্ডলের সাথে তারা মিশে যায় এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা।</p>	<p>٤٢. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا</p>

আল্লাহ কারও প্রতি অণু পরিমানও অন্যায় করেননা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তিনি কারও উপর অত্যাচার করেননা, কারও সাওয়াব নষ্ট করেননা, বরং তা আরও বৃদ্ধি করে তার সাওয়াব ও প্রতিদান কিয়ামাতের দিন দান করবেন।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৪৭) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন যে, লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন :

يَبْنِيْ اِيَّهَا اِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৬-৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফ'আতযুক্ত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফিরে এসো এবং যার অন্তরে সরিষার দানার সমান ঈমান দেখ তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আবার ফিরে যাও এবং যার অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান ছিল তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে এসো। তখন অনেক লোককে ওখান থেকে বের করে আনা হবে। আবু সাঈদ (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআন কারীমের إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা। এ আয়াতটি পাঠ করে নাও।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৩, মুসলিম ১/১৬৭)

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি কি কমিয়ে দেয়া হবে?

সাইদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً মুশরিকেরও শাস্তি কম করা হবে। তবে হ্যাঁ, জাহান্নাম হতে তাদের তো বের করা হবেইনা। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার চাচা আবু তালিব আপনার আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি আপনাকে লোকদের কষ্ট দেয়া হতে রক্ষা করতেন এবং

আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন তাহলে তার কোন লাভ হবে কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হ্যাঁ, তিনি খুব অল্প আগুনের মধ্যে রয়েছেন। যদি আমার এ সম্পর্ক না থাকত তাহলে তিনি জাহান্নামের একেবারে নিম্ন তলায় থাকতেন।’ (বুখারী ৩৮৮৩, ৬২০৮; মুসলিম ২০৯)

কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এ উপকার শুধুমাত্র আবু তালিবের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্যান্য কাফির এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মুসনাদ-ই তায়ালেসীর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আল্লাহ মু’মিনের কোন সাওয়াবের উপর অত্যাচার করেননা। দুনিয়ায় খাওয়া-পরা ইত্যাদির আকারে প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আকারে ওর প্রতিদান পাবে। তবে হ্যাঁ, কাফির তো তার সাওয়াব দুনিয়ায়ই খেয়ে নেয়। সুতরাং কিয়ামাতের দিন তার নিকটে কোন সাওয়াবই থাকবেনা। (মুসলিম ২৮০৮, তায়ালিসী ৪৭)

‘বিরাট পুরস্কার’ কী?

আবু হুরাইরাহ (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, **وَيُؤْتِ مِنْ**

لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে জান্নাত। আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে তার সম্ভ্রুষ্টি এবং জান্নাতের প্রার্থনা করছি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবু উসমান আন নাহদি (রহঃ) বলেছেন : আমি সংবাদ পাই যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাকে একটি সাওয়াবের বিনিময়ে এক লক্ষ সাওয়াব দান করে থাকেন।’ আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয় এবং আমি বলি, আমি তো তোমাদের সবার চেয়ে অধিক সময় আবু হুরাইরাহর (রাঃ) কাছে থেকেছি। আমি তো কখনও তাঁর নিকট এ হাদীসটি শুনিনি। তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, আমি নিজেই গিয়ে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এটা জিজ্ঞেস করব।

অতএব আমি সফরের আসবাবপত্র ঠিক করে নিয়ে এ বর্ণনাটির সত্যতা নিরূপণের জন্য যাত্রা শুরু করি। আমি জানতে পারি যে, তিনি হাজ্জে গিয়েছেন। আমিও হাজ্জের নিয়াত করে সেখানে পৌছি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আবু হুরাইরাহ (রাঃ)! আমি শুনেছি যে, আপনি একরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা কি সত্য? তিনি তখন বলেন, ‘তুমি কি এতে বিস্ময় বোধ করছ? তুমি কি কুরআন কারীমে পাঠ করনি যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে

ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।’
অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়,
অতি সামান্য। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৩৮) (আহমাদ ৭৯৩২)

**কিয়ামাত দিবসে আমাদের নাবী (সাঃ) তাঁর উম্মাতের
পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং কাফিরেরা চাবে তাদের
আবার মৃত্যু হোক**

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন : فَكَيْفَ

অনন্তর তখন إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং
তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? সেদিন নাবীগণকে সাক্ষী রূপে পেশ করা
হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئْنَا بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, ‘আমলনামা পেশ করা হবে এবং
নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে।’ এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার
করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৯) অন্য এক
জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন
সাক্ষী। (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলেন, ‘আমাকে কিছু কুরআন কারীম পাঠ
করে শোনাও।’ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তখন বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে কুরআন কারীম পাঠ করে কি
শোনাব? কুরআন কারীম তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে।’ তিনি বলেন :
‘হ্যাঁ, কিন্তু আমি অন্যের নিকট হতে শুনতে চাই।’ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ)

বলেন, ‘আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করতে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন আমি **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا** (সূরা নিসা, ৪ : ৪১) এ আয়াতটি পাঠ করি তখন তিনি বলেন : ‘যথেষ্ট হয়েছে।’ আমি দেখি যে, তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।’ (ফাতহুল বারী ৮/৭১২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ

সেদিন কাফিরেরা এবং রাসূলের অবাধ্যাচরণকারীরা আকাংখা করবে যে, যদি যমীন ফেটে যেত এবং মাটি ওদের ঢেকে ফেলত এবং পরে মাটি সমতল হয়ে যেত তাহলে কতইনা ভাল হত! কেননা তারা সেই দিন অসহ্য ত্রাস, অপমান এবং শাসন-গর্জনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبًا.

সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে : হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা, ৭৮ : ৪০)

অতঃপর বলা হচ্ছে, **وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا** তারা সেদিন এ সমস্ত কাজের কথা স্বীকার করে নিবে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল এবং একটি কথাও তারা গোপন করতে পারবেনা।

মুসনাদ আবদুর রায়যাকে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে : এক ব্যক্তি এসে ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন, ‘কুরআনুল হাকীমের কিছু বিষয় আমার নিকট বৈসাদৃশ্য ঠেকছে।’ তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘কুরআনুল হাকীমের কোন্ বিষয়ে তোমরা সন্দেহ রয়েছে?’ লোকটি বলেন, ‘সন্দেহ তো নেই। কিন্তু আমার জ্ঞানে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।’ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘যেখানে যেখানে তুমি বৈসাদৃশ্য মনে করছ সেইগুলি উল্লেখ কর।’ তখন লোকটি উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে বলেন, একটি দ্বারা গোপন করা প্রমাণিত হচ্ছে এবং অপরটি দ্বারা গোপন না করা প্রমাণিত হচ্ছে। তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ উত্তর প্রদান করে দু’টি আয়াতের মর্ম বুঝিয়ে দেন : কিয়ামাত দিবসে তারা যখন দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র শিরককারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তা যত বড়ই হোক না কেন, তখন মুশরিকরা মিথ্যা কথা বলবে। কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তখন তারা বলবে :

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে : আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা মুশরিক ছিল। يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ السَّيْرُ وَاللَّهُ حَدِيثًا

সে সময় তারা কামনা করবে, যেন ভূমণ্ডলের সাথে তারাও সমতল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কথাই তারা গোপন করতে পারবেনা। (আবদুর রায্যাক ১/১৬০)

৪৩। হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দাড়াইমান হইয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অশ্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী,

٤٣. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ يَمْسَسْهُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

ক্ষমশীল।

بُؤْهُكُمْ وَأَيِّدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

মদ্যপ অথবা অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষেধ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন। কেননা সে সময় সালাত আদায়কারী নিজেই বুঝতে পারেনা যে, সে কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে তাকে সালাতের স্থানে অর্থাৎ মাসজিদে আসতেও নিষেধ করা হয়েছে এবং অবগাহনের পূর্বে অপবিত্র লোককেও মাসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এরূপ ব্যক্তি কোন কাজ বশতঃ যদি মাসজিদের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে আসে এবং সেখানে অবস্থান না করে তাহলে এ যাতায়াত বৈধ।

নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। যেমন : সূরা বাকারাহর **وَالْمَيْسِرِ وَالْخَمْرِ** (২ : ২১৯) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি উমারের (রাঃ) সামনে পাঠ করেন তখন উমার (রাঃ) প্রার্থনা করেন—‘হে আল্লাহ! মদ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কারভাবে আয়াত অবতীর্ণ করুন।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী না হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরে লোকেরা সালাতের সময় মদ পান পরিত্যাগ করে। এটা শুনে উমার (রাঃ) পুনরায় এ প্রার্থনাই করেন। তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে মদ হতে দূরে থাকার পরিষ্কার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে।

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৯০-৯১) এটা শুনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমরা বিরত থাকলাম।' (আহমাদ ১/৫৩) এ বর্ণনার একটি সনদে রয়েছে যে, যখন সূরা নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয় তখন প্রথা ছিল, যখন সালাত আরম্ভ করা হত তখন একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত, 'মাতাল ব্যক্তি যেন সালাতের নিকটবর্তী না হয়। (আবু দাউদ ৪/৮০)

৪ : ৪৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করেছেন। সাদ (রাঃ) বলেন, 'আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একজন আনসারী খাদ্য রান্না করে বহু লোককে দা'ওয়াত দেন। আমরা ভোজনে পরিতৃপ্ত হই। অতঃপর আমরা মদ পান করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। এরপর আমরা পরস্পরের গৌরব প্রকাশ করতে থাকি। একটি লোক উটের চোয়ালের অস্থি উঠিয়ে সাদের (রাঃ) নাকে আঘাত করে এবং ওর চিহ্ন থেকে যায়।' সে সময় পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। অতঃপর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (আবু দাউদ ২৮, ১৭৭৩; মুসলিম ৪/১৮৭৮, তিরমিযী ৮/৪৪৬, নাসাই ৬/৩৪৮) এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেরও পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ইব্ন মাজাহ ছাড়া অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আর একটি কারণ

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) বলেছেন : আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) কিছু খাবার তৈরী করে আমাদের দা'ওয়াত দেন এবং তখন আমাদেরকে মদও পান করতে দেয়া হয়। যখন আমরা মাতাল পর্যায়ে পৌঁছলাম এবং সালাতেরও সময় হয়ে যায় তখন আমাদের

কোন একজনকে সালাতের ইমামতি করতে বলা হয়। সে পাঠ করছিল, **قُلْ**

(يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ*) (বল হে

অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাত করিনা, কিন্তু আমরা তার ইবাদাত করি যার ইবাদাত তোমরা করছ) সেই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়। (তাবারী ৮/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৩৮০) এ হাদীসটি জামিউত্ তিরমিযীতেও রয়েছে এবং এটা হাসান সহীহ। যখন কোন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় থাকে তখন অবশ্যই সে কুরআন পাঠে ভুল করে এবং সালাত আদায়ের সময় সে বিনয়ী হতে পারেনা।

এও বলা হয়েছে যে, যদিও শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তোমরা মাতাল অবস্থায় সালাত আদায় করনা, কিন্তু ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা নেশার জিনিস পানাহারও করনা।' কেননা এটা কিরূপে সম্ভব যে, একজন মদ পানকারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক সময়ে আদায় করতে পারে অথচ সে বরাবর মদ পান করতেই থাকে? মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

‘সালাত আদায় করা অবস্থায় তোমাদের কারও তন্দ্রা এলে সে যেন ফিরে আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে সে কি বলছে।’ (আহমাদ ৩/১৪২, ফাতহুল বারী ১/৩৭৭, নাসাঈ ১/২১৫) হাদীসের কতক শব্দ এও রয়েছে :

‘সে চায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিন্তু হয়তো তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা বেরিয়ে যাবে।’ (ফাতহুল বারী ১/৩৭৫)

এবারে বলা হচ্ছে : **وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا** অপবিত্র ব্যক্তিও যেন গোসল করার পূর্বে সালাতের নিকটবর্তী না হয়। তবে হ্যাঁ, অতিক্রম করা হিসাবে মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা জাযিয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরূপ অপবিত্র অবস্থায় মাসজিদের ভিতরে যাওয়া জাযিয় নয়, তবে মাসজিদের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। মাসজিদে বসতে পারবেনা। (তাবারী ৮/৩৮২)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আনাস (রাঃ), আবু উবাইদা (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) আবু আদদুহা (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাসরূক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), আমর ইব্ন দিনার (রহঃ), হাকাম

ইবন উতাইবাহ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (রহঃ), ইবন শিহাব (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৮/৩৮১-৩৮৪)

ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (রহঃ) বলেন যে, কিছু আনসার যারা মাসজিদের চতুর্দিকে বাস করতেন, তারা অপবিত্র হলে বাড়ীতে হয়তো পানি থাকতনা, আর তাদের ঘরের দরজা মাসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকত, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা ঐ অবস্থায়ই মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করতে পারেন। (তাবারী ৮/৩৮৪)

সহীহ বুখারীতে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, লোকদের ঘরের দরজা মাসজিদেই ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মৃত্যু শয্যার সময় বলেন : শুধুমাত্র আবু বাকরের (রাঃ) দরজাটি বাদে ‘মাসজিদে যেসব লোকের দরজা রয়েছে সবগুলি বন্ধ করে দাও। (ফাতহুল বারী ১/৬৬৫) এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তি কালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত আবু বাকরই (রাঃ) হবেন এবং তাঁর প্রায় সব সময় মাসজিদে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে যেন তিনি মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করতে পারেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত দরজা বন্ধ করে আবু বাকরের (রাঃ) দরজা খুলে রাখতে নির্দেশ দেন। সুনানের কোন কোন হাদীসে আবু বাকরের (রাঃ) পরিবর্তে আলীর (রাঃ) নাম রয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক ওটাই যা সহীহতে রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশাকে (রাঃ) বলেন : ‘মাসজিদ হতে মাদুরটি এনে দাও।’ তিনি তখন বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি হায়েয অবস্থায় আছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘হায়েয তো তোমার হাতে নেই।’ (মুসলিম ১/২৪৫)

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঋতুবতী নারী মাসজিদে যাতায়াত করতে পারে। নিফাস বিশিষ্টা নারীরও এ হুকুম। এরা রাস্তায় চলা হিসাবে যাতায়াত করতে পারে।

তায়াম্মুম করার বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا**

(হে মু'মিনগণ! فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দাড়াইমান হইয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অশ্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল)

এখন কোন্ কোন্ সময় তায়াম্মুম করা জাযিয় তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যে রোগের কারণে তায়াম্মুম জাযিয় হয় ওটা হচ্ছে ঐ রোগ যা পানি ব্যবহার করলে কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার বা রোগ নিরাময়ের সময় বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোন কোন আলেম প্রত্যেক রোগের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতির ফাতওয়া দিয়েছেন। কেননা আয়াত সাধারণ।

তায়াম্মুমের বৈধতার দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে সফর। সে সফর দীর্ঘ হোক বা ক্ষুদ্রই হোক। غَائِطٌ বলা হয় নরম ভূমিকে। এখানে ওর দ্বারা ছোট অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে। 'লা-মাসতুম' শব্দের দ্বিতীয় পঠন হচ্ছে 'লামাসতুম'। এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৭) অন্য আয়াতে রয়েছে :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই।

(সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৯) এখানেও **مَنْ قَبْلَ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ** রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে **لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ** এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। (তাবারী ৮/৩৯২) আলী (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), উবায়দ ইব্ন উমায়ের (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ৮/৩৯২, ৩৯৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।' এর দ্বারা অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে পানি অনুসন্ধানের পর।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে দেখেন যে, সে লোকদের সাথে সালাত আদায় না করে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন : 'জনগণের সাথে তুমি সালাত আদায় করলে না কেন? তুমি কি মুসলিম নও?' লোকটি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি মুসলিম তো বটে, কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'ঐ অবস্থায় তোমার জন্য মাটি যথেষ্ট ছিল। (ফাতহুল বারী ১/৫৪৫, মুসলিম ১/৪৭৪) **تَيَمَّم** শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা।

আরাবরা বলে **اللَّهُ يَتَيَمَّمُ** আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হিফাযাতের সঙ্গে তোমাকে রাখুন।' **صَعَبَد** শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিস যা ভূপৃষ্ঠের উপর রয়েছে। সুতরাং মাটি, বালু, গাছ প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'আমাদেরকে সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে মর্যাদা দেয়া হয়েছে (১) আমাদের সারিগুলি মালাইকা/ফেরেশতাদের সারির মত করা হয়েছে (২) আমাদের জন্য সমস্ত ভূমিকে মাসজিদ করা হয়েছে এবং (৩) ভূপৃষ্ঠের মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে যখন পানি পাওয়া না যায়।' (মুসলিম ১/৩৭১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধূলাবালি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া যদি অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যেত তাহলে তিনি তা অবশ্যই আমাদের জন্য বর্ণনা করতেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনান গ্রন্থের লেখকগণের মধ্যে ইমাম ইবন মাজাহ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘পরিস্কার মাটি হচ্ছে মুসলিমদের উযূর জন্য পবিত্র, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন সে তা ব্যবহার করবে, কারণ ওটাই তার জন্য উত্তম।’ (আহমাদ ৫/১৮০, আবু দাউদ ১/২৩৫, তিরমিযী ১/৩৮৮, নাসাঈ ১/১৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর বলা হচ্ছে :

فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

ঐ মাটি দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। তায়াম্মুম হচ্ছে উযূর স্থলবর্তী। এটা শুধুমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্য সমস্ত শরীরে মোছার জন্য নয়। সুতরাং শুধু মুখ ও হাত (হাতের কজি) মুছলেই যথেষ্ট হবে। শুধু একটি বার অর্থাৎ শুধু একবার হস্তদ্বয় মাটির উপর মুছে নেয়াই যথেষ্ট। ধূলিযুক্ত হাতকে মুখের উপর এবং হস্তদ্বয়ের কজি পর্যন্ত ফিরিয়ে নিবে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইবন আবযা নামের এক লোক আমীরুল মু‘মিনীন উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট আগমন করে বলে, ‘আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি। আমাকে কি করতে হবে?’ তিনি বলেন, ‘সালাত আদায় করতে হবেনা।’ সেখানে আম্মারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলেন, ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক সেনাদলে ছিলাম। আমি ও আপনি দু’জন অপবিত্র হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট পানি ছিলনা। আপনি তো সালাত আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করেছিলাম। ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই এবং আমি তাঁর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি হেসে উঠেন ও বলেন : ‘তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হত।’ অতঃপর তিনি মাটিতে হাত মারেন এবং ফুঁ দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের কজিদ্বয় মুছে নেন। (আহমাদ ৪/২৬৫)

তয়াম্মুম করার সুযোগ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম উম্মাহকে এক বিশেষ নি‘আমাত প্রদান করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত

প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য সমস্ত ভূমিকে মাসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমার উম্মাতের যে কোন জায়গায় সালাতের সময় এসে যাবে সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। তার মাসজিদও তার উযু সেখানেই তার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নাবীকে (আঃ) শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হত। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার নিকট প্রেরিত হয়েছি।’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০)

সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘সমস্ত লোকের উপর আমাদেরকে তিনটি ফাযীলাত দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের সারিগুলি ফেরেশতাদের সারির মত বানানো হয়েছে। (২) আমাদের জন্য সারা ভূমিকে মাসজিদ বানানো হয়েছে। (৩) পানি পাওয়া না গেলে ওর মাটিকে উযু করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।’ (মুসলিম ১/৩৭১) উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন :

فَإِمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا পানি না পাওয়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের উপর মাসাহ কর, তিনি মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। তাঁর মার্জনা ও ক্ষমার অবস্থা এই যে, পানি না পাওয়ার সময় তায়াম্মুমকে শারীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করে ঐভাবে সালাত আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এ অনুমতি না দিলে তোমরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে। কেননা এ পবিত্র আয়াতে সালাতকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নেশার অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় কিংবা বে-উযু অবস্থায় সালাত আদায় করাকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যে পর্যন্ত সে নিজের কথা নিজেই বুঝতে না পারবে, নিয়মিতভাবে গোসল না করবে এবং শারীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী উযু না করবে। কিন্তু রোগের অবস্থায় ও পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমকে উযু ও গোসলের স্থলভুক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার এ অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্যই।

তায়াম্মুমের আদেশ নাযিল হওয়ার কারণ

আয়িশা (রাঃ) বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। যখন আমরা ‘বাইদা’ অথবা ‘যাতুল জায়েশ’ নামক স্থানে ছিলাম তখন আমার হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। হারটি খোঁজার

জন্য যাত্রীদলসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে থেমে যান। তখন না আমাদের নিকট পানি ছিল, না ঐ প্রান্তরের কোন জায়গায় পানি ছিল। জনগণ আমার পিতা আবু বাকরের (রাঃ) নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন : ‘দেখুন আমরা তাঁর কারণে কি বিপদেই না পড়েছি!’ অতএব আমার পিতা আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উরুর উপর স্থায়ী মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসেই তিনি আমাকে বলেন, ‘তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও জনগণকে এখানে থামিয়ে দিয়েছ। এখন না তাদের নিকট পানি রয়েছে, না কোন জায়গায় পানি দেখা যাচ্ছে?’ মোট কথা, তিনি আমাকে খুব শাসন গর্জন করেন এবং আল্লাহ জানেন কত কি তিনি আমাকে বলেছেন। এমনকি স্থায়ী হস্ত দ্বারা আমার পার্শ্বদেশে প্রহার করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমি সামান্য নড়াচড়াও করিনি। সারা রাত্রি কেটে যায়। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন। কিন্তু পানি ছিলনা। সে সময় আল্লাহ তা‘আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন সমস্ত লোক তায়াম্মুম করেন। উসাইয়েদ ইব্ন হুজাইর (রাঃ) তখন বলেন : ‘হে আবু বাকরের পরিবারবর্গ! এ বারাকাত আপনাদের প্রথম নয়। তখন যে উটে আমি আরোহণ করেছিলাম ঐ উটটি উঠালে ওর নীচে আমার হার পেয়ে যাই।’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৪, ৭/২৪, ১২/১৮০; মুসলিম ১/২৭৯)

৪৪। তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের এক অংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছা করে যে, তোমরাও সঠিক পথ হতে দূরে সরে যাও।

٤٤. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ

৪৫। এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে সম্যক অবগত আছেন; পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই

٤٥. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى

যথেষ্ট ।	بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا
<p>৪৬। ইয়াহুদীদের মধ্যে কেহ কেহ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে : আমরা শ্রবণ করলাম ও আশ্রয় করলাম; এবং বলে, শোন - না শোনার মত; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে ‘রায়না’; এবং যদি তারা বলতো : ‘আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও’, তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা।</p>	<p>٤٦. مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ تَحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ غَيْرِ مُسْمَعٍ وَرَعَيْنَا لَيًّا بِلُسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعَ وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا</p>

ব্রাহ্ম পথ অবলম্বন, আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন এবং ইসলামকে বিদ্রূপ করায় ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন : يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضَلُّوا ۖ তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছা করে যে, তোমরাও সঠিক পথ হতে দূরে সরে যাও। ইয়াহুদীদের (কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক) একটি নিন্দনীয় স্বভাব এও রয়েছে যে, তারা সুপথের

বিনিময়ে ভ্রান্তপথকে গ্রহণ করেছে। শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং পূর্ববর্তী নাবীগণ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেটাও তারা শিষ্যদের নিকট হতে ভেট/নৈবেদ্য নেয়ার লোভে প্রকাশ করছেন। বরং সাথে সাথে এটাও কামনা করছে যে, স্বয়ং মুসলিমরাও যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তা‘আলার গ্রন্থকে অস্বীকার করে এবং সুপথ ও সঠিক ইল্মকে পরিত্যাগ করে। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের শত্রুদের সংবাদ খুব ভালভাবেই রাখেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন তাদের প্রতারণার ফাঁদে না পড়। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার সাহায্যই যথেষ্ট। তোমরা বিশ্বাস রাখ যে, যারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তিনি তাদের অবশ্যই সহায়তা করে থাকেন এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। তারা আল্লাহ তা‘আলার কথার ভাবার্থ বদলিয়ে দেয় এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর এ কাজ তারা জেনে-শুনে ও বুঝে করে থাকে। এর ফলে তারা আল্লাহ তা‘আলার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের কথা নকল করে বলছেন যে, তারা বলে :

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا হে মুহাম্মাদ! আপনি যা কিছু বলেন আমরা তা শুনি, কিন্তু মান্য করিনা।’ (তাবারী ৮/৪৩৩) তাদের কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা জেনে ও বুঝে স্পষ্টভাষায় কিভাবে নিজেদের অপবিত্র খেয়ালের কথা প্রকাশ করছে এবং বলছে : **وَأَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ** (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন : ‘আমরা যা বলি তা আপনি শুনুন, আল্লাহ করেন আপনি যেন না শোনেন।’ (তাবারী ৮/৪৩৪) ইহাই হল ইয়াহুদীদের ঠাট্টা মশকরা করার পদ্ধতি, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। এ কথা তারা উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে বলত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। তারা **رَاعِنَا** বলত। এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যেত যে তারা বলছে, ‘আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দিন।’ কিন্তু তারা এ শব্দ দ্বারা রাসূলের প্রতি অভিসম্পাত করত। এর পূর্ণ ভাবার্থ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا** (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৪) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যা তারা বাইরে প্রকাশ করত, স্বীয় জিহ্বাকে বক্র করে বিদ্রূপ সূচক

ভঙ্গিতে অন্তরের মধ্যে তার উল্টো ভাব গোপন করে রাখত। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবী করত। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ
 وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا এবং যদি তারা বলত :
 ‘আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও’, তাহলে এটা
 তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে
 অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা।

ইয়াহুদীদের অন্তরকে মঙ্গল হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রকৃত ঈমান
 পূর্ণভাবে তাদের অন্তরে স্থানই পায়না। এ বাক্যের তাফসীরও পূর্বে বর্ণিত
 হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, উপকার দানকারী ঈমান তাদের মধ্যে নেই।

৪৭। হে গ্রন্থ প্রাপ্তরা!
 তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার
 সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা
 অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি
 বিশ্বাস স্থাপন কর ঐ সময়
 আসার পূর্বে, যখন আমি
 অনেক মুখমন্ডল বিকৃত করে
 দিব। অতঃপর তাদেরকে
 পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দিব
 অথবা আসহাবে সাবতের প্রতি
 যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম
 তদ্রূপ তাদের প্রতিও
 অভিসম্পাত করি; এবং
 আল্লাহর আদেশ কার্যকরী
 হয়েই থাকে।

٤٧. يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ
 وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ
 نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ
 آلِ سَبْتٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

৪৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর
 সাথে অংশী স্থাপন করলে

٤٨. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

তাকে ক্ষমা করবেননা এবং
তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা
করবেন এবং যে কেহ
আল্লাহর অংশী স্থির করে সে
মহাপাপে আবদ্ধ হলো।

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

আহলে কিতাবীদেরকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান এবং এর বিপরীত কিছু না করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, ‘আমি আমার মহা
মর্যাদাবান গ্রন্থ আমার উত্তম নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে স্বয়ং
তোমাদের কিতাবের সত্যতা ও স্বীকৃত রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর উপর ঈমান
আনয়ন কর এর পূর্বে যে, আমি তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেই। অর্থাৎ মুখ
বিপরীত দিকে করে দেই এবং তোমাদের চক্ষু এ দিকের পরিবর্তে ঐ দিকে হয়ে
যায়।’ কিংবা ভাবার্থ এই যে, ‘তোমাদের চেহারা নষ্ট করে দেই যাতে তোমাদের
কান, নাক সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এ বিকৃত চেহারাও উল্টো হয়ে যায়।’
এ শাস্তি তাদের কর্মেরই পূর্ণ ফল। এরা সত্য হতে সরে মিথ্যার দিকে এবং সুপথ
হতে বিপথের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কাজেই আল্লাহ তা‘আলাও তাদেরকে ধমক
দিয়ে বলছেন :

আমিও এভাবেই
তোমাদের মুখ উল্টিয়ে দিব যেন তোমাদেরকে পিছন পায় চলতে হয়।
তোমাদের চক্ষুগুলি তোমাদের পিছনের দিকে করে দিব।’ (তাবারী ৮/৪৪০,
৪৪১) আর এ রকমই কেহ কেহ **أَعْنَاقِهِمْ** (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ :
৮) এ আয়াতের তাফসীরেও বর্ণনা করেছেন। মোট কথা, তাদের পথভ্রষ্টতা ও
সুপথ হতে সরে পড়ার এ খারাপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইয়াহুদী আলেম কা‘ব আল আহবারের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি (৪ : ৪৭) শুনেই কা‘ব ইব্ন আহবার (রহঃ)
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে যে, ঈসা ইব্ন

মুগিরাহ্ (রহঃ) বলেন : আমরা ইবরাহীমের (রহঃ) সাথে যখন কা'বের (রহঃ) ইসলাম গ্রহণের আলোচনা করছিলাম তখন তিনি বলেন : 'কা'ব (রহঃ) উমারের (রাঃ) যুগে মুসলিম হয়েছিলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে মাদীনায় আগমন করেন। উমার (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বলেন : 'হে কা'ব! মুসলিম হয়ে যাও।' উত্তরে তিনি বলেন : আপনারা তো কুরআন কারীমে পড়েছেন, 'যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তা উঠায়নি তাদের দৃষ্টান্ত গাধার ন্যায়, যে বোঝা বহন করে থাকে।'

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارًا ۚ يَتَسَاءَلُونَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ ফাসিক/পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ : ৫) আর আপনি এটাও জানেন যে, যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আমিও তাদের মধ্যে একজন। তখন উমার (রাঃ) তাকে ছেড়ে দেন। তিনি এখান হতে রওয়ানা হয়ে 'হিম্স' পৌছেন। সেখানে তিনি শুনতে পান যে, তাঁরই বংশের একজন লোক এ আয়াতটি (৪ : ৪৭) পাঠ করছেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে কা'ব (রহঃ) ভয় করেন যে, এ আয়াতে যাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান কিনা এবং না জানি তার আকারই বিকৃত হয়ে যায়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠেন : يَا رَبِّ اسْلَمْتُ : হে আমার রাব্ব! আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।' অতঃপর তিনি হিম্স হতেই স্বীয় দেশ ইয়ামানে ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি স্বপরিবারে মুসলিম হয়ে যান। (তাবারী ৮/৪৪৬) অতঃপর বলা হচ্ছে :

أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ
(শনিবারীয়দের) প্রতি যেক্রপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করি। অর্থাৎ যারা কৌশল করে শনিবার দিন মৎস শিকার করেছিল, অথচ সে দিন তাদেরকে মৎস শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যার প্রতিফল

স্বরূপ তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল। এর বিস্তারিত ঘটনা ইনশাআল্লাহ সূরা আ'রাফে আসবে। এরপর বলা হচ্ছে :

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে। তিনি যখন কোন নির্দেশ দেন তখন এমন কেহ নেই যে, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বা তাকে বাধা প্রদান করে।

তাওবাহ করা ব্যতীত আল্লাহ শিরুক ক্ষমা করেননা

এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অংশীস্থাপনকারীর পাপ ক্ষমা করেননা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে মুশরিক, তার জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ এ পাপ ছাড়া অন্য পাপ যত বেশি হোক না কেন তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ পবিত্র আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে কিছু কিছু বর্ণনা করছি।

মুসনাদ আহমাদে আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দা! তুমি যে পর্যন্ত আমার ইবাদাত করতে থাকবে এবং আমার নিকট হতে ভাল আশা পোষণ করবে, আমিও তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে থাকব। হে আমার বান্দা! তুমি যদি সারা পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আগমন কর, আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব এ শর্তে যে, তুমি আমার সাথে অংশীস্থাপন করনি।' (আহমাদ ৫/১৫৪)

মুসনাদ আহমাদে আবু যার (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলে এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।' এ কথা শুনে আবু যার (রাঃ) বলেন, 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে।' তিনবার একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'যদিও আবু যারের নাক ধূলায় মলিন হয়।' সেখান থেকে আবু যার (রাঃ) স্বীয় চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলতে বলতে যান : 'যদিও আবু যারের নাক ধূলায় মলিন হয়।' এরপরেও যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন এ বাক্যটি অবশ্যই বলতেন। (আহমাদ ৫/১৫২, ফাতহুল বারী ১০/২৯৪, মুসলিম ১/৯৫)

বায্‌যায্‌ (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হতে আমরা বিরত ছিলাম। অবশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত আয়াত শ্রবণ করি এবং তিনি এ কথাও বলেন : ‘আমি আমার শাফাআতকে কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের কাবীরা পাপকারীদের জন্য পিছিয়ে রেখেছি।’ (কাশ্‌ফ আল আসতার ৪/৮৪) এরপর বলা হচ্ছে :

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন— আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘তা এই যে, তুমি আল্লাহর অংশ স্থির কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

৪৯। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।

٤٩. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

৫০। লক্ষ্য কর : তারা কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে? স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

٥٠. أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

৫১। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রহের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা মূর্তি ও শাইতানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।

৫১. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا

৫২। এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন; এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোনই সাহায্যকারী খুঁজে পাবেনা।

৫২. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

ইয়াহুদীদের নিজেদেরকে নিষ্পাপ মনে করা এবং তাগুতকে মান্য করার জন্য তাদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার

হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন যে, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা বলেছিল : আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র। (তাবারী ৮/৪৫২) তারা আরও বলেছিল : ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছাড়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেনা। (তাবারী ৮/৪৫৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাকর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে অন্য একটি লোকের প্রশংসা করতে

শুনে বলেন : ‘অফসোস! তুমি তোমার সঙ্গীর স্কন্ধ কেটে দিলে।’ অতঃপর বলেন : যদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই পড়ে তাহলে যেন সে বলে : ‘আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ এরূপ মনে করি।’ কিন্তু ‘সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা‘আলার নিকট এরূপই পবিত্র’ এ কথা যেন না বলে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ না, বরং তিনিই যাকে চান তাকে পবিত্র করেন।

অর্থাৎ হিদায়াত দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই। কারণ সকল কিছুই ভাল-মন্দ জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তিনিই। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا তাদের প্রতি সামান্য (ফাতিল) পরিমাণও অন্যায় করা হবেনা। অর্থাৎ কেহকে প্রতিদান দেয়ার সময় কোন ধরনের অবিচার করা হবেনা। তা সেই প্রতিদানের পরিমাণ যত ছোটই হোক না কেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্যরা আরাবী শব্দ ‘ফাতিল’ এর অর্থ করেছেন খেজুরের বিচির মাঝখানে যে সাদা লম্বা সূতার মত দেখা যায় ঐ অংশকে। (তাবারী ৮/৪৫৮, ৪৫৯) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ লক্ষ্য কর : তারা কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে! যেমন তারা বলছে :

لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى

ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১১১) তারা আরও বলে :

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১৮) অন্যত্র তাদের ভাষায় বলা হয়েছে :

لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৪) আর যেমন তারা তাদের পূর্বপুরুষের সৎকাজের

উপর নির্ভর করে রয়েছে। অথচ একের কাজ অন্যকে কোন উপকার দেয়না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

ওটি একটি দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৩৪) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا তাদের এসব কথা বলাই তাদের প্রকাশ্য অপরাধী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্ন ফায়দ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, جِبْت শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘যাদু’ এবং طَاغُوت শব্দের অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ৮/৪৬২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা‘বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) এ কথাই বলেন। طَاغُوت শব্দের বিশ্লেষণ সূরা বাকারায় হয়ে গেছে, সুতরাং এখানে ওর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) طَاغُوت সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ‘তারা হল যাদুকর এবং তাদের নিকট শাইতান আসে।’ (ইব্ন আবী হাতিম ৩/৯৯৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছে মানুষ রূপী শাইতান, তাদের নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে বিচারক মেনে থাকে। (তাবারী ৮/৪৬২) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া যার ইবাদাত করা হয়।

অবিশ্বাসী কাফিরেরা কখনো মু‘মিনদের চেয়ে উত্তম নয়

এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বলেন : وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী। তাদের মূর্খতা, ধর্মহীনতা এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌঁছে গেছে যে, তারা কাফিরদেরকে মুসলিমদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ)

ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুয়াই ইবন আখতার এবং কা'ব ইবন আশরাফ নামে দুই ইয়াহুদী মাক্কাবাসীদের নিকট আগমন করে। মাক্কাবাসীরা তাদেরকে বলে : 'তোমরা আহলে কিতাব ও পণ্ডিত লোক। আচ্ছা বলত আমরা ভাল, না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল? তখন তারা বলে : 'তোমাদের পরিচয় দাও এবং মুহাম্মাদের বর্ণনা দাও।' মাক্কাবাসীরা বলে : 'আমরা আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখি, উট যবাহ করে গরীবদেরকে আহার করাই, দুগ্ধ মিশ্রিত পানি পান করাই, দেনাদারকে মুক্ত করি, হাজীদেরকে পানি পান করাই। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, তাঁর কোন পুত্র-সন্তান নেই এবং গিফার গোত্রের চোর/হাজীরা তাঁর সঙ্গ লাভ করেছে। এখন বলত, আমরা ভাল, না সে ভাল? তখন ঐ দু'জন বলে : 'তোমরাই ভাল। তোমরাই সোজা ও সঠিক পথে রয়েছ।' (ইবন আবী হাতিম ৩/৯৯৪) এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيًّا তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে ঐশ্বর একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? এ ঘটনাটি ইবন আব্বাস (রাঃ) এবং সালাফগণেরও অনেকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের তিরস্কার করেন

এ আয়াতটিতে (সূরা নিসা, ৪ : ৫২) ইয়াহুদীদের তিরস্কৃত করা হয়েছে। তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ায় এবং আখিরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। কারণ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা মূর্তি/দেবতাদের কাছে সাহায্য কামনা করছে। তারা শুধু কাফিরদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্যই তাদের জ্ঞানের বিপরীত এ তোষামোদমূলক কথাগুলো উচ্চারণ করছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা কৃতকার্য হতে পারবেনা। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। তারা সমস্ত আরাবকে দলভুক্ত করে এক সম্মিলিত বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে মাদীনার উপর আক্রমণ চালায় (আহযাবের যুদ্ধ)। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে বাধ্য হন। অবশেষে বিশ্ব জগত দেখে নেয় যে, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহ তা'আলাই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং স্বীয় প্রতাপ ও ক্ষমতার বলে কাফিরদেরকে উল্টো মুখে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

আল্লাহ কাফিরদেরকে ত্রুদ্বাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৫)

<p>৫৩। তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা।</p>	<p>৫৩. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا</p>
<p>৫৪। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি।</p>	<p>৫৪. أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا</p>
<p>৫৫। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট।</p>	<p>৫৫. فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا</p>

ইয়াহুদীদের হিংসা ও অশোভন আচরণ

এখানে অস্বীকৃতি সূচক ভাষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রশ্ন করছেন :
 لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ তারা কি রাজত্বের কোন অংশের মালিক? অর্থাৎ
 তারা মালিক নয়। অতঃপর তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ
 النَّاسَ نَقِيرًا যদি এরূপ হত তাহলে তারা কারও কোন উপকার করতনা। বিশেষ
 করে তারা আল্লাহ তা‘আলার শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে
 এতটুকুও দিত না যতটুকু খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলে পর্দা থাকে। যেমন অন্য
 আয়াতে আছে :

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ

বল : যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও ‘ব্যয়
 হয়ে যাবে’ এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০০)
 এটা স্পষ্ট কথা যে, এতে সম্পদ কমে যেতে পারেনা, তথাপি কৃপণতা
 তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ قَتُورًا মানুষ বড়ই কৃপণ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৯) তাদের কার্পণ্যের
 বর্ণনা দেয়ার পর তাদের হিংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে :

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ তাহলে কি তারা
 লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু
 দান করেছেন? আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বড়
 নাবুওয়াত দান করেছেন এবং তিনি যেহেতু আরাবের অন্তর্ভুক্ত, বানী ইসরাঈলের
 অন্তর্ভুক্ত নন, সেহেতু তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে এবং জনগণকে তাঁর
 সত্যতা স্বীকার করা হতে বিরত রাখছে।

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘এখানে أَمْ
 يَحْسُدُونَ النَّاسَ এর ভাবার্থ হচ্ছে তারা মনে করে, ‘আমরাই একমাত্র উত্তম
 জাতি, অন্য কেহ নয়।’ (তাবারানী ১১/১৪৬)

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا আমি ইবরাহীমের বংশধরকে নাবুওয়াত দিয়েছিলাম যারা ছিল বানী ইসরাঈল গোত্র এবং ইবরাহীমের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছি এবং রাজত্বও দান করেছি। তথাপি তাদের মধ্যে অনেক মু'মিন থাকলেও অনেক কাফিরও ছিল। তারা নাবী ও কিতাবকে মেনে নেয়নি। নিজেরা তো স্বীকার করেইনি, এমনকি অন্যদেরকেও বিরত রেখেছিল। অথচ ঐ সব নাবী (আঃ) বানী ইসরাঈল ছিল। কাজেই তারা যখন নিজেদের নাবীদেরকেই অস্বীকার করেছে তখন হে মুহাম্মাদ! তারা তোমাকে যে অস্বীকার করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কারণ তুমি তো তাদের (বানী ইসরাঈলের) মধ্য হতে নও।

অতএব হে মুহাম্মাদ! তাদের কুফরীর কারণ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে আরও মারাত্মক অপরাধ। ফলে যে সত্যসহ তোমার আগমন ঘটেছে তা থেকে তারা আরও দূরে সরে গেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا জাহান্নামের আগুনই তাদের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর তাদেরকে তাদের শাস্তির কথা শোনানো হচ্ছে যে, জাহান্নামের আগুনে দক্ষীভূত হওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, মিথ্যা প্রতিপাদন ও বিরোধিতার এ শাস্তিই যথেষ্ট।

৫৬। নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎ পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব - যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, হিকমতের অধিকারী।

٥٦. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا
نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেষ্ট করাব - যার নিম্নে স্রোতস্থিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; সেখানে তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে ছায়া শীতল স্থানে প্রবেষ্ট করাব।

৫৭. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

যারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলকে অস্বীকার করে তাদের শাস্তি

যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে, এখানে তাদেরই শাস্তি ও মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ۚ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎ পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ করে তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং সেই আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং তাদের শরীরের সূক্ষ্ম লোম পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে। শুধু এটাই নয়, বরং এ শাস্তি হবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী।

আল আমাশ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন, যখন তাদের দেহের চামড়া পুড়ে যাবে তখন আবার চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের চামড়া হবে কাগজের মত সাদা। (তাবারী ৮/৪৮৪) এ হাদীসটি ইব্ন আবী হাতিম ও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন : তাদের চামড়া আগুনে ছাঁকা দেয়া হবে, যা প্রতিদিন সত্তর হাজার বার হবে। হুসাইন (রহঃ) ফুদাইল (রহঃ) হতে আরও বর্ণনা করে যে, হিশাম (রহঃ) বলেন,

হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেছেন যে, **كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ** অর্থাৎ যখন তাদের দেহ সম্পূর্ণ পুড়ে যাবে এবং দেহের মাংস নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন বলা হবে ‘আবার পূর্বের আকার ধারণ কর’। ফলে আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। (তাবারী ৮/৪৮৫)

সং আমলকারীদের পুরস্কার হল জান্নাত

এরপর সং লোকদের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে : **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** তারা আদন জান্নাতে অবস্থান করবে যার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের ইচ্ছা মত নদীগুলি প্রবাহিত হবে। স্বীয় অট্টালিকায়, বাগানে, পথে-ঘাটে মোট কথা, যেখানেই তার মন চাইবে সেখানেই নদীগুলি বইতে থাকবে। সবচেয়ে বড় মজার কথা এই যে, এসব নি‘আমাত হবে চিরস্থায়ী। এগুলি না নষ্ট হবে, না কিছু হ্রাস পাবে, না ধ্বংস হবে, না শেষ হবে এবং না ফিরিয়ে নেয়া হবে। **لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ** আরও থাকবে তাদের জন্য সুন্দরী হুরগণ, যারা হবে হায়েয, নিফাস, ময়লা, দুর্গন্ধ এবং অন্যান্য খারাবী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা হবে সমস্ত দোষ থেকে ত্রুটিমুক্ত এবং বাজে কাজ থেকে মুক্ত। (তাবারী ১/৩৯৫) ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), আতিয়িয়াহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা প্রস্রাব, পায়খানা, ঋতুস্রাব, থুথু, কফ এবং গর্ভধারণ থেকে পবিত্র। **وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا** আর তাদের জন্য থাকবে সুদূর প্রসারিত গাছের ছায়া, যা হবে অত্যন্ত আরামদায়ক ও মনোমুগ্ধকর। তাফসীর ইব্ন জারীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ থাকবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও তার ছায়া শেষ হবেনা। ওটা হচ্ছে ‘শাজারাতুল খুলদ’ (চিরস্থায়ী বৃক্ষ)।’ (তাবারী ৮/৪৮৯)

<p>৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।</p>	<p>৫৮. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا</p>
---	---

অধিকারীকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। ছামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে তোমাদের সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তুমি তার গচ্ছিত রাখা দ্রব্য তাকে ফেরত দাও এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনা’। (আহমাদ ৩/৪১৪, আবু দাউদ ৩/৮০৫, তিরমিযী ৪/৪৭৯) আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ। আল্লাহ তা‘আলার সমস্ত হক আদায় করণও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সিয়াম, সালাত, কাফ্ফারা, নযর ইত্যাদি। আর বান্দাদের পরস্পরের সমস্ত হক এর অন্তর্গত। যেমন গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি যে হক আদায় করবেনা তার জন্য কিয়ামাতের দিন তার থেকে তা আদায় করে নেয়া হবে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়া হবে। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে।’ (মুসলিম ৪/১০৯৭)

এ আয়াতের শান-ই নুযূলে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা জয় করেন এবং শান্তভাবে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করেন

তখন তিনি স্বীয় উস্ত্বীর উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক উসমান ইব্ন তালহাকে (রাঃ) আহ্বান করেন এবং তার নিকট চাবি চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, গচ্ছিত বিষয় তার উপর অর্পণ কর যে উহার যোগ্য। অতঃপর তিনি উসমান ইব্ন তালহাকে (রাঃ) ডেকে তার হাতে চাবিটি প্রত্যর্পণ করেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘর থেকে বের হয়ে এ আয়াতাত্শটি পাঠ করেন। আমার মা-বাবা তার জন্য উৎসর্গ হউন। এর পূর্বে আমি কখনও তাঁকে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনিনি। (তাবারী ৮/৪৯২) এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টিই বেশির ভাগ লোক বর্ণনা করেছেন। তবে এ আয়াতের ব্যাপকতা সার্বজনীন। এ জন্যই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়া (রহঃ) বলেন যে, আয়াতটি মু'মিন ও মুশরিক উভয়ের জন্য। অর্থাৎ আয়াতে বর্ণিত আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

ন্যায়ানুগ বিচার করতে হবে

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে : **وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ** 'ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর।' বিচারকদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় বিচারপতি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ হচ্ছে, 'কোন অবস্থায়ই তোমরা ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করনা।' মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং শাহর ইব্ন হাওশাব (রহঃ) বলেন : এ আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছে যাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। অর্থাৎ যারা জনগণের মাঝে বিচার মীমাংসা করে থাকেন। (তাবারী ৮/৪৯০)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যে পর্যন্ত না সে অত্যাচার করে। যখন সে অত্যাচার করে তখন তা তারই দিকে সমর্পণ করেন। (ইব্ন মাজাহ ২/৭৭৫) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে : 'এক দিনের ন্যায় বিচার চল্লিশ বছরের ইবাদাতের সমান।' (আল কান্য় ৬/১২)

অতঃপর বলা হচ্ছে, **إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ** গচ্ছিত জিনিস ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ এবং ন্যায় বিচার করার নির্দেশ ও অনুরূপ

শারীয়াতের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উত্তম ও ফলদায়ক, যেসব আদেশ ও নিষেধ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি জারী করে থাকেন।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا তিনি শ্রবণকারী, পরিদর্শক। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথাসমূহ শ্রবণকারী এবং তোমাদের কার্যাবলী পরিদর্শনকারী।

৫৯। হে মু‘মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা বিচারক তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।

۵۹. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

আল্লাহর আইন পালনে শাসকের অনুসরণ করতে হবে

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট নৌবাহিনীতে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাইফা ইব্ন কায়েসকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তার ব্যাপারে أَطِيعُوا اللَّهَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০১, মুসলিম ৩/১৪৬৫, আবু দাউদ ৩/৯২, তিরমিযী ৫/৩৬৪, নাসাঈ ৭/১৫৪) ইমাম তিরমিযী একে হাসান গারীব বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন

আনসারীকে তার নেতৃত্ব দান করেন। একদা তিনি সৈন্যদের উপর কি এক ব্যাপারে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি?’ তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, ‘তোমরা জ্বালানী কাষ্ঠ জমা কর।’ অতঃপর তিনি আগুন আনার ব্যবস্থা করে কাষ্ঠগুলো জ্বালিয়ে দেন। তারপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। সেনাবাহিনীর লোকেরা আগুনে প্রায় ঝাপ দিচ্ছিল। তখন একজন নব্য যুবক সৈন্যদেরকে বলেন, ‘আপনারা আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আপনারা তাড়াহুড়া করবেননা যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনিও যদি আপনাদেরকে আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন তাহলে ওতে প্রবেশ করবেন।’ অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি বললেন : ‘তোমরা যদি আগুনে ঝাপ দিতে তাহলে আর কখনও সে আগুন হতে বের হতে পারতেনা। জেনে রেখ, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির কাজেই রয়েছে।’ (আহমাদ ১/৮২, ফাতহুল বারী ৭/৬৫৫, মুসলিম ৩/১৪৬৯)

সুনান আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘শ্রবণ করা ও মান্য করা মুসলিমের উপর ফারয, তা তার নিকট প্রিয়ই হোক বা অপছন্দনীয়ই হোক, যে পর্যন্ত না (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে তখন শ্রবণও করতে হবেনা এবং মান্যও করতে হবেনা।’ (আবু দাউদ ২৬২৬, বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা শ্রবণ করা ও মান্য করার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করি, তাতে আমাদের সন্তুষ্টিই হোক অথবা অসন্তুষ্টিই হোক, আমরা কঠিন অবস্থায়ই থাকি বা সহজ অবস্থায়ই থাকি এবং যদিও আমাদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়া হয়, আর আমরা কাজের যোগ্য ব্যক্তি হতে যেন কাজ ছিনিয়ে না নেই। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কিন্তু তোমরা যদি স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও যার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত কোন প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। (সে সময়

তোমাদেরকে শ্রবণও করতে হবেনা, মান্যও করতে হবেনা)। (ফাতহুল বারী ১৩/২০৪, মুসলিম ৩/৪৭০)

সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা শ্রবণ কর ও মান্য কর যদিও তোমাদের উপর একজন ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানিয়ে দেয়া হয়।’ (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০) সহীহ মুসলিমে উম্মুল হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন : ‘যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে শাসক নির্বাচন করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে তাহলে তোমরা তার কথা শ্রবণ করবে ও মান্য করবে।’ (মুসলিম ১৮৩৮) অন্য বর্ণনায় ‘কর্তিত নাক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসও হয়’ এ শব্দগুলি রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **أُولَى الْأَمْرِ** দ্বারা বোধশক্তি সম্পন্ন ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ। বাহ্যিক কথা তো এটাই মনে হচ্ছে, তবে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই রয়েছে। এ শব্দটি সাধারণ, এর ভাবার্থ ‘আমীর’ ও ‘আলেম’ উভয়ই হতে পারে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে :

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ

তাদেরকে আল্লাহ ওয়াল্লা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেন? (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৩) অন্য জায়গায় রয়েছে :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৭, ১৬ : ৪৩) সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমার আনুগত্য স্বীকারকারী হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের অবাধ্য হয়েছে সে আমারই অবাধ্য হয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ১৩/১১৯, মুসলিম

৩/১৪৬৬) সুতরাং এ হল আলেম ও আমীরগণের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ। ইরশাদ হচ্ছে, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ তোমরা আল্লাহ তা‘আলার অনুগত হও’ অর্থাৎ তাঁর কিতাবের অনুসারী হও। ‘আল্লাহ তা‘আলার রাসূলের অনুগত হও’ অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের উপর আমল কর। وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আর তোমাদের আদেশদাতাদের আনুগত্য স্বীকার কর। অর্থাৎ তাদের ঐ নির্দেশের প্রতি অনুগত হও যেখানে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য রয়েছে। তারা যদি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশের বিপরীত কোন আদেশ করে তাহলে তাদের সে আদেশ মান্য করা মোটেই উচিত নয়। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে : আনুগত্য শুধু সৎ কাজের জন্য। (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০)

কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বিচার করার অপরিহার্যতা

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও।’ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দিকে ফিরে এসো, যেমন মুজাহিদের (রহঃ) তাফসীরে রয়েছে। (তাবারী ৮/৫০৪) সুতরাং এখানে স্পষ্ট ভাষায় মহা সম্মানিত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে যে, যে মাসআলায় মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, ঐ মাসআলা ধর্মনীতি সম্পর্কীয়ই হোক বা ধর্মের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কীয়ই হোক, এর মীমাংসার জন্য একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এ দু’টির মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নিতে হবে। যেমন কুরআন মাজীদে অন্য আয়াতের রয়েছে :

وَمَا آخِذْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। (সূরা শূরা, ৪২ : ১০) অতএব কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দিবে এবং যে মাসআলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই মিথ্যা। কুরআন কারীমে ঘোষণা হচ্ছে : সত্যের পরে যা রয়েছে তা শুধু পথভ্রষ্টতাই বটে।’ এ জন্যই এখানেও এ নির্দেশের সাথেই ইরশাদ হচ্ছে : ‘যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক।’ অর্থাৎ যদি

তোমরা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই এবং যাতে মতভেদ রয়েছে, যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা এসবের মীমাংসা কর, এ দু’টির মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নাও।’ অতএব সাব্যস্ত হল যে, মতভেদী জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যারা কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসেনা তারা আল্লাহ তা‘আলার উপর বিশ্বাস রাখেনা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

বিবাদসমূহে ও মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান লাভের কাজ।

৬০। তুমি কি তাদের প্রতি
লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে
যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ
হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা
অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি
তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা
নিজেদের মুকাদ্দমা তাগুতের
নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও
তাদেরকে আদেশ করা
হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস
করে; পক্ষান্তরে শাইতান
তাদেরকে প্রতারিত করে
পথভ্রষ্ট করতে চায়।

٦٠. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

৬১। আর যখন তাদেরকে
বলা হয় যে, আল্লাহ যা
অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে

٦١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا

এবং রাসুলের দিকে এসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ
صُدُودًا

৬২। অনন্তর তখন কিরূপ হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি।

٦٢. فَكَيْفَ إِذَا أَصَبْتَهُمْ
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ
جَاءُوكَ تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا
إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

৬৩। তাদের অন্তরসমূহে যা আছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত হও এবং তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কথা বল।

٦٣. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
قَوْلًا بَلِيغًا

কুরআন-হাদীস ছাড়া

অন্য কোন আইন দ্বারা বিচার করে কাফিরেরা

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর এবং এ কুরআনুল হাকীমের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু যখন

কোন বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তারা কুরআন মাজীদ ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেনা, বরং অন্য দিকে যায়। এ আয়াতটি ঐ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। একজন ছিল ইয়াহুদী এবং অপর জন ছিল আনসারী। ইয়াহুদী আনসারীকে বলছিল, চল আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে এর মীমাংসা করিয়ে নিব। আনসারী বলছিল, চল আমরা কা’ব ইব্ন আশরাফের (ইয়াহুদী পণ্ডিত) নিকট যাই। এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করত বটে, কিন্তু অন্তরে অজ্ঞতা যুগের আহকামের দিকে আকৃষ্ট হতে চাচ্ছিল। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। আয়াতটি স্বীয় আদেশ ও শব্দসমূহ হিসাবে সাধারণ। এ সমুদয় ঘটনা এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দা করছে যে কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফাইসালা রজু করে। এখানে এটাই হচ্ছে ‘তাগুত’ এর ভাবার্থ। **صُدُّودٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে : বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭০) মু’মিনদের এ উত্তর হতে পারেনা। বরং তাদের উত্তর অন্য আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

মু’মিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে : আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। (সূরা নূর. ২৪ : ৫১)

মুনাফিকদের নিন্দা জানানো

এরপর মুনাফিকদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে : **فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بَمَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بَمَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بَمَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ** **قَدَمْتُ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا**

(অনন্তর তখন কিরূপ হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি) অর্থাৎ হে নাবী! যখন তারা তাদের পাপের কারণে বিপদে পড়ে এবং তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন তারা দৌড়ে তোমার নিকট আগমন করে এবং ওয়র পেশ করে শপথ করে করে বলে : ‘আমরা কল্যাণ ও সম্মিলন ব্যতীত কিছুই কামনা করিনি এবং আপনাকে ছেড়ে আমাদের মুকাদ্দামা অন্যের নিকট নিয়ে যাওয়ার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মন যোগানো ও তাদের সাথে বাহ্যিক মিল রাখা। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আস্থা মোটেই নেই।’ যেমন আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বলেন :

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدِيمِينَ

এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং তারা বলে : আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অতঃপর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবু বারযা আসলামী ছিল একজন যাদুকর। ইয়াহুদীরা তাদের মুকাদ্দামার মীমাংসা তার দ্বারা করিয়ে নিত। মুসলিমদের কিছু লোক তার কাছে মাসআলার জন্য গেলে এর পরিশ্রেক্ষিতে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا হতে يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (তাবারানী ১১/৩৭৩) এরপর বলা হচ্ছে :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ এ প্রকারের লোকের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহ তা‘আলা ভালভাবেই জানেন। তাঁর

নিকট ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন জিনিসও গুপ্ত নয়। তিনি তাদের ভিতরের ও বাইরের সব খবরই রাখেন। সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত থাক এবং তাদেরকে তাদের অন্তরের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে শাসন-গর্জন করনা। তারা যেন কপটতা দ্বারা অন্যদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি না করে তজ্জন্য তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাক এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কথা বল ও তাদের জন্য প্রার্থনাও কর।

৬৪। আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে, এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবুলকারী, করুণাময় দেখতে পেত।

٦٤. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

৬৫। অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিন্তে কবুল না করে।

٦٥. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অপরিহার্যতা

আল্লাহ বলেন : **لِيُطَاعَ إِلَّا رَسُولٌ مِّنْ أَرْسَلْنَا وَمَا** (আমি এতদ্ব্যতীত

কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাদের আনুগত্য স্বীকার করবে) ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক যুগের রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করা তাঁর উম্মাতের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফার্য হয়ে থাকে। রিসালাতের পদমর্যাদা এই যে, তাঁর সমস্ত আদেশকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মনে করা হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : **بِأَذْنِ اللَّهِ** এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এর ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে এবং তা তাঁর শক্তি ও ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। (তাবারী ৮/৫১৬) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছাড়া কেহ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে পারেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে **إِذْ تَحْسُونَهُم**

بِأَذْنِهِ 'যখন তুমি তাঁর হুকুমে তাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলে। (সূরা আলে

ইমরান, ৩ : ১৫২) এখানেও **أَذْن** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অব্যাহত ও পাপীদের প্রতি ইরশাদ করছেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটও যেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন জানায়। তারা যখন এরূপ করবে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ কবুল করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَوْ جَدُّوْاَ لِلَّهِ تَوَّابًا رَّحِيْمًا তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবুলকারী ও করুণাময় হিসাবে পেত।

কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষণ না সে বিচারের ভার রাসূলের (সাঃ) উপর অপর্ণ করে এবং তাঁর ফাইসালায় রাযী-খুশি থাকে

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মানিত সন্তার শপথ করে বলছেন : 'কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারেনা যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে

আল্লাহ তা‘আলার শেষ নাবীকে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে না নিবে এবং প্রত্যেক নির্দেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাহকে, প্রত্যেক (সহীহ) হাদীসকে গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র ঐ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুগত না করবে।’ মোট কথা, যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে মু‘মিন। অতএব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে সম্ভ্রষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এবং স্বীয় অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ না করে। তারা যেন সমস্ত হাদীসকেই স্বীকার করে নেয়। তারা যেন হাদীসসমূহকে স্বীকার করা হতে বিরত না থাকে, না ঐগুলিকে সরিয়ে দেয়ার উপায় অনুসন্ধান করে, না ওর মত অন্য কোন জিনিসকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে, আর না ঐগুলি খণ্ডন করে এবং না ঐগুলি মেনে নেয়ার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।’ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন : ‘যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেহ মু‘মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ঐ বিষয়ের অনুগত করে যা আমি আনয়ন করেছি।’

সহীহ বুখারীতে উরওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নালা দিয়ে বাগানে পানি নেয়ার ব্যাপারে একটি লোকের সঙ্গে যুবাইরের (রাঃ) বিবাদ হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন : ‘হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি নেয়ার পর তুমি আনসারীর বাগানে পানি যেতে দাও।’ তাঁর এ কথা শুনে আনসারী বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আপনার ফুপাতো ভাই তো!’ এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বলেন : ‘হে যুবাইর (রাঃ)! তুমি তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর তা বন্ধ রেখ যে পর্যন্ত না সে পানি বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর পানি তোমার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও।’ প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পস্থা বের করেন যাতে যুবাইরের (রাঃ) কষ্ট না হয় এবং আনসারীরও প্রশস্ততা বেড়ে যায়। কিন্তু আনসারী যখন সেটা তার পক্ষে উত্তম মনে করলনা, তখন তিনি যুবাইরকে (রাঃ) তার পূর্ণ হক প্রদান করলেন। যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি ধারণা করি যে, **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ** এ আয়াতটি এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৩)

মুসনাদ আহমাদের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, এ আনসারী বদরী সাহাবী ছিলেন। অন্য বর্ণনা হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল এই যে, পানির নালা হতে প্রথমেই ছিল যুবাইরের (রাঃ) বাগান এবং তারপরে ঐ আনসারীর বাগান। আনসারী যুবাইরকে (রাঃ) বলতেন, ‘পানি বন্ধ করবেননা। পানি আপনা আপনি এক সাথে দু’ বাগানেই আসবে।’

হাফিয আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন দুহাইন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দামরাহ (রহঃ) বলেছেন : দু’ব্যক্তি তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি একটা মীমাংসা করে দেন। যে ব্যক্তির প্রতিকূলে বিচারের মীমাংসা চলে যায় সে বলল : আমি ইহা মানিনা। তখন অপর ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : তাহলে তুমি কি চাও? সে বলল : চল, আমরা আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাই। আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাওয়ার পর যে ব্যক্তির পক্ষে ফাইসালা দেয়া হয়েছিল সে বলল : আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য গিয়েছিলাম এবং তিনি যে ফাইসালা দিয়েছেন তা আমার পক্ষে যায়। তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফাইসালা দিয়েছেন আমার তরফ থেকেও ঐ একই ফাইসালা।

যে ব্যক্তি মীমাংসায় হেরে যায় সে বলল : চল, আমরা উমার ইব্ন খাতাবের (রাঃ) কাছে যাই। তারা এখানে এলে যার অনুকূলে ফাইসালা হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনা উমারের (রাঃ) নিকট বর্ণনা করে। উমার (রাঃ) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, ‘এটা সত্য কি?’ সে স্বীকার করে নেয়। উমার (রাঃ) তখন তাদেরকে বলেন, ‘এখানে তোমরা থাম, আমি এসে ফাইসালা করছি।’ তিনি তরবারী নিয়ে এলেন এবং যে ব্যক্তি বলেছিল, ‘আমাদেরকে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়ে দিন’ তিনি তাকে হত্যা করেন। এর প্রেক্ষিতেই **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ** এ আয়াতটি নাযিল হয়। (দুররুল মানসুর ২/৩২২)

৬৬। আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিষ্কাশিত হও তাহলে

٦٦. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ
أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ

<p>তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতনা এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও।</p>	<p>دِيرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا</p>
<p>৬৭। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম।</p>	<p>৬৭. وَإِذَا لَا تَتَيْنَهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا</p>
<p>৬৮। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম।</p>	<p>৬৮. وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا</p>
<p>৬৯। আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।</p>	<p>৬৯. وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا</p>
<p>৭০। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আল্লাহর</p>	<p>৭০. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ</p>

জ্ঞানই যথেষ্ট।

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا

যা আদেশ করা হয় তা অধিকাংশ লোকই অমান্য করে

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন, অধিকাংশ লোক এরূপ যে, তাদেরকে যদি ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করারও নির্দেশ দেয়া হত যা তারা এ সময়ে করতে রয়েছে তাহলে তারা ঐ কাজগুলোও করতনা। কেননা তাদের হীন প্রকৃতিকে আল্লাহ তা‘আলার বিরুদ্ধাচরণের উপরই গঠন করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর ঐ জ্ঞানের সংবাদ দিচ্ছেন যা হয়নি। কিন্তু যদি হত তাহলে কিরূপ হত? আবু ইসহাক সাবীঈ (রহঃ) বলেন যে, যখন وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ

أَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন একজন মনীষী বলেছিলেন :

‘যদি আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তা পালন করতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে এটা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শোনে তখন তিনি বলেন : ‘নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে ঈমান এতই ময়বুত যে, তা পর্বত অপেক্ষাও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’ (ইবন আবী হাতিম) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا. وَإِذَا لَأَتَيْنَاهُم مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

এবং যদিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম। وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا এটাই হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় আমি তাদেরকে জান্নাত দান করতাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পথ প্রদর্শন করতাম।’

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে

আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশের উপর আমল করে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে তাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্মানের ঘরে নিয়ে যাবেন এবং নাবীগণের বন্ধুরূপে পরিগণিত করবেন। তারপর সত্য সাধকদের বন্ধু করবেন, যাদের মর্যাদা নাবীগণের পরে। তারপর তাদেরকে তিনি শহীদের সঙ্গী করবেন। অতঃপর সমস্ত মু‘মিনের সঙ্গী করবেন যাদের ভিতর ও বাহির সুসজ্জিত। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এঁরা কতই না পবিত্র ও উত্তম বন্ধু!

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় দুনিয়ায় অবস্থানের এবং আখিরাতের দিকে গমনের মধ্যে অধিকার দেয়া হয়।’ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত হন, যে রোগ হতে তিনি আর সেরে উঠতে পারেননি তখন তাঁর কণ্ঠস্বর বসে যায়। সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনি, **مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ**

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ তাদের সঙ্গে যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ করেছেন, যারা নাবী, সত্য সাধক, শহীদ ও সৎকর্মশীল। আমি তখন জানতে পারি যে, তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৩, মুসলিম ৪/১৮৯৩)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন : **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْحَمْنِيْ بِالرَّفِيقِ الْاَعْلٰی** হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (মুসলিম ৪/১৮৯৪) অতঃপর তিনি এ নশ্বর জগত হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এ কথা তিনি তিনবার পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেন। পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত তাঁর উক্তির ভাবার্থ এটাই।

এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা আপনার কাছে উঠা-বসা করছি এবং আপনার মুখমণ্ডলও দর্শন করছি। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তো আপনি নাবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন তো আমরা আপনার নিকট পৌঁছতে পারবনা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেননা। সে সময় জিবরাঈল (আঃ) **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ**

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ এ আয়াতটি আনয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোক পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সুসংবাদ প্রদান করেন। (তারাবী ৮/৫৩৪) এ হাদীসটি মুরসাল সনদেও মাসরুফ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আমির আশ শা’বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে সনদটি খুবই উত্তম।

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই-এ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে আমার প্রাণ হতে, পরিবার পরিজন হতে এবং সন্তান অপেক্ষাও বেশি ভালবাসি। আমি বাড়ীতে থাকি বটে, কিন্তু আপনাকে স্মরণ করা মাত্র আপনার নিকট আগমন ছাড়া আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা। অতঃপর এসে আপনাকে দর্শন করি। কিন্তু যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আপনি নাবীগণের সঙ্গে সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন, তখন আমার ভয় হয় যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ লাভ করলেও আপনাকে হয়তো দেখতে পাবনা।’ তখন এ আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দানে বিরত থাকেন। এরপর উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাকিম আবু আবদুল্লাহ মাকদিসী (রহঃ) তার ‘সিফাতুল জান্নাহ’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এর বর্ণনাক্রমে আমি কোন ভুল দেখতে পাচ্ছিনা। (তাবারানী সাগীর ৩৩০৮) এ বর্ণনাটির আরও ধারা রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাবিআ' ইব্ন কা'ব আসলামী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করতাম এবং তাঁকে পানি ইত্যাদি এনে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বলেন : 'কিছু যাক্ষ কর'। আমি বললাম : জান্নাতে আপনার বন্ধুত্ব যাক্ষ করছি। তিনি বললেন : 'এটা ছাড়া অন্য কিছু?' আমি বললাম : শুধু এই একটিই প্রার্থনা। তখন তিনি বললেন : 'তাহলে অধিক সাজদাহর মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনের উপর আমাকে সাহায্য কর।' (মুসলিম ৪৮৯)

মুসনাদ আহমাদে আমার ইব্ন মুররাহ আল-জাহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, স্বীয় সম্পদের যাকাত প্রদান করি এবং রামাযানের সিয়াম পালন করি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন : 'যে ব্যক্তি এর উপরই মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামাতের দিন এভাবে নাবীগণের সঙ্গে, সত্য সাধকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন পিতা-মাতার অবাধ্য না হয়।' (জা'মি অল মাসানিদ ওয়াস সুন্নাহ ১০/৭৭)

সহীহ ও মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহে সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট দল হতে ক্রম পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি দল এমন এক গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখে যার যোগ্যতার তুলনায় তাদের কোন তুলনাই হতে পারেনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'মানুষ তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে সে ভালবাসত।' (বুখারী ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪০)

আনাস (রাঃ) বলেন, 'মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত খুশি হয়েছিল তত খুশি অন্য কোন জিনিসে হয়নি। অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! আমার ভালবাসা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বাকর (রাঃ) এবং উমারের (রাঃ) সঙ্গে রয়েছে। তাই আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁদের সঙ্গেই উঠাবেন, যদিও আমার আমল তাঁদের মত নয়।' (ফাতহুল বারী ৭/৫১) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ। কারণ আল্লাহর দয়ার ফলেই তারা জান্নাতের সৌভাগ্যশালী হয়েছেন, তাদের আমলের প্রতিদান হিসাবে তারা ইহা কখনও লাভ করতে সক্ষম হতেননা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই অনুগ্রহ ও দান এবং তাঁর বিশেষ করুণা, যার কারণে তাঁর বান্দা এত মর্যাদা লাভ করেছে, এটা সে তার কাজের ফলে লাভ করেনি। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন। অর্থাৎ হিদায়াত ও তাওফীক লাভের হকদার যে কে তা তাঁর খুব ভালরূপেই জানা আছে।

৭১। হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার সরঞ্জাম তুলে নাও, অতঃপর পৃথকভাবে বহির্গত হও অথবা সম্মিলিতভাবে অভিযান কর।

۷۱. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا

৭২। আর তোমাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যে শৈথিল্য করে; অনন্তর যদি তোমাদের উপর বিপদ নিপতিত হয় তাহলে বলে : আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাদের সাথে উপস্থিত ছিলামনা।

۷۲. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا

৭৩। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর সন্নিধান হতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ, সম্পদ অবতীর্ণ হয় তাহলে এরূপভাবে বলে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ ছিলনা - হায়!

۷۳. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلِيَّتَنِي

যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম তাহলে মহান ফলপ্রদ সুফল লাভ করতাম!	كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا
৭৪। অতএব যারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত ক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে; এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর নিহত অথবা বিজয়ী হয়, তাহলে আমি তাকে মহান প্রতিদান প্রদান করব।	٧٤. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রীম প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সর্বদা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সদা যেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে যাতে শত্রুরা অতি সহজে তাদের উপর জয়যুক্ত না হয়। তারা সব সময় যেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রস্তুত রাখে, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শক্তি দৃঢ় করে। নির্দেশ মাত্রই যেন তারা বীর বেশে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট সৈন্যদলে বিভক্ত হয়েই হোক অথবা সবাই সম্মিলিতভাবেই হোক সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা যেন যুদ্ধের আস্থানে সাড়া দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে।

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে **فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ** এর অর্থ হচ্ছে তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বহির্গত হও।’ আর **اَوَانْفِرُوا جَمِيعًا** এর অর্থ হচ্ছে ‘তোমরা সম্মিলিতভাবে বেড়িয়ে পড়।’ (তাবারী ৮/৫৩৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং খুসাইফ আল জাযারীও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ৮/৫৩৮)

জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ

মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও কয়েকজন মনীষী বলেন যে, **وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن** এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৩৮) মুনাফিকদের স্বভাব এই যে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং অপরকেও জিহাদে না যেতে উৎসাহিত করে। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত এবং অন্যদেরকেও অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করত, যেমনটি ইব্ন জুরাইয (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ঐ নির্বোধেরা বুঝেনা যে, ঐ মুজাহিদেরা জিহাদে অংশ গ্রহণের ফলে যে সাওয়াব লাভ করেছেন তা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছে। যদি তারাও জিহাদে অংশ নিত তাহলে মুসলিমদের মত তারাও গাযী হওয়ার মর্যাদা এবং ধৈর্য ধারণের সাওয়াব লাভ করত অথবা শহীদ হওয়ার গৌরব লাভ করত। পক্ষান্তরে যদি মুসলিম মুজাহিদগণ আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শত্রুদের উপর জয়ী হয় এবং শত্রুরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়, আর এর ফলে মুসলিমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ও দাস-দাসী নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে ঐ মুনাফিকরা চরম দুঃখিত হয় এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এত হা-হতাশ করে ও এমন এমন কথা মুখ দিয়ে বের করে যেন মুসলিমদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই ছিলনা। তাদের ধর্মই যেন অন্য। তারা তখন বলে, ‘হায়! আমরাও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে আমরাও গানীমাতের সম্পদ পেতাম এবং তাদের মত আমরাও দাস-দাসী ও ধন-সম্পদের অধিকারী হতাম।’

জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ বলা হয়েছে, দুনিয়া লাভই কাফির মুনাফিকদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা ইহকালের বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ ঘোষণা করা উচিত। তারা কুফরী ও অবিশ্বাসের কারণে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্বংস করেছে। তাই মুনাফিকদের বলা হচ্ছে, হে মুনাফিকের দল! তোমরা জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহ তা‘আলার পথের মুজাহিদ

তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনা। তাদের উভয় অবস্থায় পুরস্কার রয়েছে। নিহত হলেও তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং বিজয়ী বেশে ফিরে এলেও রয়েছে গানীমাতের মালের বিরাট অংশ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে : ‘আল্লাহর পথের মুজাহিদের যামিন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। হয় তিনি তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন, আর না হয় যেখান হতে সে বের হয়েছে সেখানেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।’ (ফাতহুল বারী ৬/২৫৩, মুসলিম ৩/১৪৯৬)

৭৫। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছনা? অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে অত্যাচারী এই নগর হতে নিষ্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

۷۵. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

৭৬। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা শাইতানের পক্ষে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা

۷۶. الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শাইতানের
কৌশল দুর্বল।

يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

নির্যাতিতদের সাহায্যার্থে জিহাদ করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে তাঁর পথে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন, ‘গুটি কয়েক দুর্বল ও অসহায় লোক মাক্কায় রয়ে গেছে যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। মাক্কায় অবস্থান তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাদের উপর কাফিরেরা নানা প্রকার উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে মুক্ত করে আন। তারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে, ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এ অত্যাচারীদের গ্রাম হতে অর্থাৎ মাক্কা হতে বহির্গত করুন।’ মাক্কাকে নিম্নের আয়াতেও গ্রাম বলা হয়েছে :

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ

তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৩) ঐ দুর্বল লোকেরা মাক্কার কাফিরদের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করছে এবং সাথে সাথে স্বীয় প্রার্থনায় বলছে, ‘হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ হতে আপনি আমাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নির্বাচন করুন।’

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমি এবং আমার আত্মাও ঐ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।’ (ফাতহুল বারী ৮/১০৩) এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বলেন :

مُؤْمِنِينَ فَفَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

তা‘আলার আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে কাফিরেরা শাইতানের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, তারা যেন আল্লাহ তা‘আলার শত্রু ও শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, শাইতানের কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে বৃথা পর্যবসিত হবে।

৭৭। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত সমূহ সংযত রাখ এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফার্য করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বলল : হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্য করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল : পার্থিব ফায়দা সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুরের বীজের পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।

۷۷. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

৭৮। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদূর দুর্গে অবস্থান কর; এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে : এটা আল্লাহর

۷۸. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ

নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল : সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা!

يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

৭৯। তোমার নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহর সন্নিধান হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হতে হয়ে থাকে, এবং আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি; এবং আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।

৭৯. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

কেহ কেহ চাচ্ছিল যে, জিহাদ করার নির্দেশ বিলম্বে দেয়া হোক

ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলিমরা মাক্কায় অবস্থান করছিল তখন তারা ছিল দুর্বল। তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল। সেখানে কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলিমরা তাদেরই শহরে ছিল। কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল তাদের অধিক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেননি। বরং তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলির উপর যেন তারা আমল করে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, তারা যেন এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ করে। আর ওদিকে কাফিরেরা ভীষণ বীরত্বের সাথে মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারা ছোট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন হতে কঠিনতম শাস্তি দিতে থাকে। কাজেই মুসলিমগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিলেন।

যা হোক, তারা অতি আগ্রহের সাথে ঐ সময়ের অপেক্ষা করছিলেন যে, কখন তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। নানাবিধ কারণে ঐ সময় মুসলিমদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি ছিলনা। যেমন বহু সংখ্যক শত্রুদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। মাক্কা নগরী হল মুসলিমদের পবিত্রতম স্থান, তাই এ নগরীতে যুদ্ধ করার কোন আয়াত নাযিল হয়নি। মুসলিমরা যখন পরে মাদীনায় তাদের নিজদের শহর গড়ে তোলে এবং দিন দিন তাদের ক্ষমতা, শক্তি ও সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপরেও মুসলিমদের জিহাদে অংশ গ্রহণের মনোবাসনা পূর্ণ করার লক্ষ্যে আল্লাহর তরফ থেকে আয়াত নাযিল হলে তাদের কেহ কেহ কাফিরদের সাথে সম্মুখ সমরে অংশ নেয়ার ব্যাপারে ভীষণ ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে।

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই কতক লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জিহাদের কথা চিন্তা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং জ্বীদের বিধবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন হওয়ার দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। رَبَّنَا لَمْ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ। ভয় পেয়ে তারা বলে উঠে, 'হে আমাদের রাব্ব! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন!' এ বিষয়কেই অন্য আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فِإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ

وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ

মু'মিনরা বলে : একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে

তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২০) এর সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে, মু'মিনগণ বলে : (যুদ্ধের) কোন সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন রুগ্ন অন্ত রবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার করে উঠে এবং ভ্রু কুণ্ঠিত করে তোমার দিকে তাকায় এবং ঐ ব্যক্তির মত চক্ষু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচেতন্য হয়ে থাকে। তাদের জন্য আফসোস!

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কায় আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কুফরী অবস্থায় আমরা সম্মানিত ছিলাম, আর আজ ইসলামের অবস্থায় আমাদের লাঞ্ছিত মনে করা হচ্ছে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

‘আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এ নির্দেশই রয়েছে যে, আমি যেন ক্ষমা করে দেই। সাবধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করনা।’

অতঃপর মাদীনায় হিজরাতের পর এখানে যখন জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন কিন্তু লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চায়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৪৯, নাসাঈ ৬/৩২৫, হাকিম ২/৩০৭)

অতঃপর যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয় তখন দুর্বল ঈমানের লোকেরা মানুষকে ঐরূপ ভয় করতে শুরু করে যেমন আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করা উচিত; বরং তার চেয়েও বেশি ভয় করতে থাকে এবং বলে, ‘হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফার্য করলেন? স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে দিলেন না কেন?’ তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় :

قُلْ دُنْيَاكُمْ دُنْيَا قَلِيلٍ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ
অস্থায়ী এবং জান্নাতের তুলনায় খুবই নগণ্যও বটে। আর আখিরাত আল্লাহ ভীরুদের জন্য দুনিয়া হতে বহুগুণ উত্তম ও পবিত্র।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে উত্তরে বলা হয়, ‘আল্লাহভীরুদের পরিণাম সূচনা হতে বহুগুণে উত্তম। তোমাদেরকে তোমাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের একটি সং আমলও বিনষ্ট হবেনা। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে কারও উপর এক চুল

পরিমাণও অত্যাচার হওয়া অসম্ভব। এ বাক্যে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ উৎপাদন করে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে জিহাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মৃত্যুকে কেহ এড়াতে পারবেনা, সে পেয়ে বসবেই

এরপর বলা হচ্ছে : **أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ** তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।' কোন মধ্যস্থতা কেহকেও এটা হতে বাঁচাতে পারবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ২৬) আর এক আয়াতে আছে :

كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ الْمَوْتِ

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীব হয়ে থাকবে? (সূরা আশিয়া, ২১ : ৩৪) এগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জিহাদ করুক আর না'ই করুক, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্তা ছাড়া সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থানও নির্দিষ্ট রয়েছে।

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রাঃ) স্বীয় মরণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেন : 'আল্লাহর শপথ! আমি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি। তোমরা এসে দেখ যে, আমার শরীরের এমন কোন অংশ নেই যেখানে বল্লম, বর্শা, তীর, তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের চিহ্ন দেখা যায়না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিলনা বলে আজ তোমরা দেখ যে, আমি গৃহ শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। সুতরাং কাপুরুষের দল আমার জীবন হতে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।'

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, মৃত্যুর খাবা হতে সুউচ্চ, সুদৃঢ় এবং সংরক্ষিত দুর্গ ও অট্টালিকাও রক্ষা করতে পারবেনা।

মুনাফিকরা নাবীর (সাঃ) আগমনে তাদের অশুভ পরিণতি টের পেয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** : যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যদি তারা খাদ্যশস্য, ফল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি লাভ করে তাহলে তারা বলে, ‘এটা আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এসেছে।’ **وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ** আর যদি তাদের উপর কোন অমঙ্গল নিপতিত হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, সম্পদ ও সন্তানের স্বল্পতা এবং ক্ষেত ও বাগানের ক্ষতি ইত্যাদি পৌঁছে যায় তখন তারা বলে, ‘হে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আপনার কারণেই হয়েছে।’ অর্থাৎ এটা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং মুসলিম হওয়ার কারণেই হয়েছে। ফিরাউনের অনুসারীরাও অমঙ্গলের বেলায় মূসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কু-লক্ষণ বলে অভিহিত করত। যেমন কুরআনুল হাকীমের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত : এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদাপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১৩১) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ১১) অতএব এখানেও এ মুনাফিকরা যারা বাহ্যিক মুসলিম, কিন্তু অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে তাদের নিকট যখন কোন অমঙ্গল পৌঁছে তখন তারা বাট করে বলে ফেলে যে, এ ক্ষতি ইসলাম গ্রহণের কারণেই হয়েছে।

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এ অপবিত্র কথা ও জঘন্য বিশ্বাসের খণ্ডন করছেন যারা বলে : 'সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তাঁর ফাইসালা ও ভাগ্যলিখন প্রত্যেক ভাল-মন্দ, ফাসিক, ফাজির, মু'মিন এবং কাফির সবার উপরেই জারী রয়েছে। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।' তিনি তাদের সে উক্তি খণ্ডন করছেন যা তারা শুধুমাত্র সন্দেহ, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং অত্যাচারের বশবর্তী হয়েই বলে থাকে। তিনি বলেন, তাদের কি হয়েছে যে, কোন কথা বুঝার যোগ্যতা তাদের মধ্য হতে লোপ পাচ্ছে?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন, অতঃপর যে সম্বোধন সাধারণ (General) হয়ে গেছে : مَا

أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ তোমাদের নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা। আর তোমাদের উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমাদের স্বীয় কর্মেরই প্রতিফল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা, ৪২ : ৩০) এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তোমাদের পাপের কারণে'। অর্থাৎ কাজেরই প্রতিফল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا হে নাবী! তোমার কাজ হচ্ছে শুধু শারীয়াতকে প্রচার করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কাজকে, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরই সাক্ষ্য এ ব্যাপারেও যথেষ্ট যে, তুমি প্রচার কাজ চালিয়েছ। তোমার ও তাদের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তিনি সব কিছুই দেখছেন। তারা তোমার সাথে যে অবাধ্যাচরণ ও অহংকার করছে তাও তিনি দেখতে রয়েছেন।

৮০। যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে,

۸۰. مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

<p>এবং যে ফিরে যায় আমি তার জন্য তোমাকে রক্ষক রূপে প্রেরণ করিনি।</p>	<p>أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا</p>
<p>৮১। আর তারা বলে : আমরা অনুগত। কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল, তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি নিষ্পৃহ হও এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।</p>	<p>৮১. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا</p>

রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অর্থ হল

আল্লাহকেই মান্য করা

আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ হচ্ছে, ‘আমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের যে অনুগত প্রকারান্তরে সে আমারই অনুগত। তার যে অবাধ্য সে আমারই অবাধ্য। কেননা আমার নাবী নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেনা। আমার পক্ষ হতে তার উপর যে অহী করা হয় তাই সে বলে থাকে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাকে যে মেনে চলে সে আল্লাহকে মানে এবং যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে। আর যে আমীরের অনুগত হয় সে আমারই অনুগত হয় এবং যে আমীরের অবাধ্য হয় সে আমারই অবাধ্য হয়’। (আহমাদ ১/২৫২, ফাতহুল বারী ৬/১৩৫, মুসলিম ৩/১৪৬৬)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে নাবী তার পাপ তোমার উপর নেই। তোমার কাজ তো

শুধুমাত্র পৌছে দেয়া। ভাগ্যবান ব্যক্তি মেনে নিবে এবং মুক্তি ও সাওয়াব লাভ করবে এবং তাদের ভাল কাজের সাওয়াব তুমিও লাভ করবে। কেননা তার পথপ্রদর্শক তো তুমিই এবং তার সৎ কাজের শিক্ষকও তুমিই। আর যে ব্যক্তি মানবেনা সে হতভাগা। সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে সে হিদায়াত লাভ করবে, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। (মুসলিম ২/৫৯৪)

মুনাফিকদের বোকামীর ধরণ

এরপর মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে : وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ তারা বাহ্যিকভাবে তো আনুগত্য স্বীকার করছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করছে। কিন্তু যখনই দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে, এখান হতে চলে গিয়ে নিজের জায়গায় পৌছে যায় তখন এমন হয় যে, তাদের রূপ যেন এরূপ ছিলইনা। এখানে যা কিছু বলেছিল, রাতে গোপনে গোপনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পরামর্শ করতে থাকে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ গোপন ষড়যন্ত্র সবই জানেন। তাঁর নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাদের এ কার্যাবলী এবং এসব কথা তাঁর নির্দেশক্রমে তাদের আমলনামায় লিখে নিচ্ছেন।

সুতরাং তাদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে যে, তাদের এ চাল-চলন কতই না জঘন্য। তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট তোমাদের ঐ সব কাজ গোপন নেই। তোমরা তোমাদের ভিতর ও বাহির যখন এক রাখতে পারছনা তখন তোমাদের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত সংবাদ যিনি রাখেন, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ নিকৃষ্ট কাজের জন্য কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের স্বভাব অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন :

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا

তারা বলে : আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি। (সূরা নূর. ২৪ : ৪৭)

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ তুমি তাদের প্রতি বিমুখ হও; ধৈর্য

ধারণা কর, তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের অবস্থা তাদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে বলনা। তুমি তাদের হতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর্য থাক। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর। যে ব্যক্তি তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

<p>৮২। তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।</p>	<p>৮২. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ^৮ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا</p>
<p>৮৩। আর যখন তাদের নিকট কোন শাস্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পন করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শাইতানের অনুসরণ করতে।</p>	<p>৮৩. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْرِ أَوْ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ^৯ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوَّلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^{১০} وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا</p>

আল কুরআন সত্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন কারীমকে চিন্তা ও গবেষণা সহকারে পাঠ করে। উহা হতে যেন তারা বিমুখ না হয়, অবজ্ঞা না করে। ওর মযবুত রচনা, নৈপুণ্য পূর্ণ নির্দেশাবলী এবং বাকচাতুর্য

সম্বন্ধে যেন চিন্তা করে। সাথে সাথে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, এ পবিত্র গ্রন্থটি মতভেদ ও মতানৈক্য হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা ইহা মহাবিজ্ঞানময় ও পরম প্রশংসিত আল্লাহরই বাণী। তিনি নিজে সত্য এবং তদ্রূপ তাঁর কালামও সম্পূর্ণ সত্য। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করছেন :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا মুশরিক ও মুনাফিকদের ধারণা হিসাবে এ কুরআন যদি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত না হত এবং কারও মনগড়া কথা হত তাহলে অবশ্যই মানুষ ওর মধ্যে বহু মতভেদ লক্ষ্য করত।’ সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থের এসব দ্রুটি হতে মুক্ত হওয়া এরই পরিষ্কার দলীল যে, এটা আল্লাহরই বাণী। যেমন আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞানে পরিপক্ক আলেমদের কথা বর্ণনা করেন যে, তারা বলে : আমরা এগুলির উপর ঈমান এনেছি, এগুলি সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত। অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট আয়াত ও অস্পষ্ট আয়াত সবই সত্য। এ জন্যই তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলিকে স্পষ্ট আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে মুনাফিকীর বক্রতা রয়েছে তারা স্পষ্ট আয়াতগুলি অস্পষ্ট আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা প্রথম প্রকারের লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের নিন্দা করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আমার ইবন শুয়াইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর দাদা বলেন : আমি এবং আমার ভাই এমন এক সমাবেশে বসেছিলাম যা আমার নিকট এত প্রিয় ছিল যে, আমি একটি লাল বর্ণের উট পেলেও এ মাজলিসের তুলনায় ওটাকে নগণ্য মনে করতাম। আমরা গিয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজার উপর কয়েকজন মর্যাদাবান সাহাবী (রাঃ) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা ওখান থেকে চলে যাওয়া সমীচীন মনে না করে এক দিকে বসে পড়ি। সেখানে কুরআন মাজীদেব কোন আয়াত নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। অবশেষে কথা বেড়ে যায় এবং তাঁরা পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা

শুনতে পেয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে আগমন করেন এবং তাঁর মুখমন্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। তাঁদের উপর মাটি নিক্ষেপ করে বললেন :

‘তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নাবীগণের উপর মতানৈক্য আনয়ন করেছিল এবং আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত বলেছিল। জেনে রেখ যে, কুরআন মাজীদে কোন আয়াত অপর আয়াতের বিপরীত বহন করেনা, বরং সত্যতা প্রতিপাদন করে। তোমরা যেটা জান তার উপর আমল কর এবং যেটা জাননা সেটা যারা জানে তাদের উপর ছেড়ে দাও।’ (আহমাদ ২/১৮১)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন : আমি দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই। আমি বসে রয়েছি এমন সময় দু’টি লোকের মধ্যে একটি আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ধ্বংসের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে তাদের মতভেদ সৃষ্টি করা’। (আহমাদ ২/১৯২, মুসলিম ৪/২০৫৩, নাসাঈ ৫/৩৩)

অসমর্থিত ও তদন্তবিহীন খবর বর্ণনা করায় নিষেধাজ্ঞা

এরপর ঐ তাড়াহুড়াকারীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে যারা কোন নিরাপত্তা বা ভয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সত্যাসত্য যাচাই না করেই এদিক হতে ওদিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। অথচ ওটা সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মানুষকে মিথ্যাবাদী বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা’ই বর্ণনা করে।’ (মুসলিম ১/১০, আবু দাউদ ৫/২২৬)

মুগীরা ইব্ন শূ‘বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘বর্ণিত হয়েছে’ অথবা ‘অমুক অমুককে বলেছেন’ এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ৫, আবু দাউদ ৪৯৯২) এ হাদীসে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন কিছুই বাস্তবতা এবং সত্যাসত্য যাচাই না করেই অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়। অর্থাৎ ‘লোকেরা যেসব কথা বলে থাকে এরূপ বহু কথা সত্যাসত্য যাচাই ও চিন্তা ভাবনা না করেই বর্ণনা করে থাকে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি কোন কথা বর্ণনা করে এবং সে জানে যে, ওটা যথার্থ নয় সেও দুই মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী।’ (মুসলিম ১/৯) এখানে আমরা উমারের (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করছি যার বিশুদ্ধতার উপর মতৈক্য রয়েছে। যখন তিনি শোনেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় বাড়ী হতে বের হয়ে এসে মাসজিদে প্রবেশ করেন। এখানেও তিনি জনগণকে এ কথাই বলতে শোনেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : ‘আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘না।’ তখন তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ পাঠ করেন। হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, অতঃপর তিনি মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন : ‘হে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্বীগণকে তালাক দেননি।’ সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উমার (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রথমে তথ্য অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং এ আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে সঠিক তথ্যানুসন্ধান করার জন্য মূল উৎসের খোঁজ নেয়া। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَا تَبْعُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ মু‘মিন ব্যতীত তোমরা শাইতানের অনুসারী হয়ে যেতে।’ (তাবারী ৮/৫৭৫)

৮৪। অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কারও ভার অর্পণ করা হয়নি এবং বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধুদ্ধ কর; অচিরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন; এবং আল্লাহ সংগ্রামে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর।

٨٤. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكْفُ إِلَّا نَفْسَكَ^ع وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ^ط عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا^ع وَاللَّهُ أَشَدُّ

بَاسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

৮৫। যে কেহ সৎ সুপারিশ করবে সে ওর অংশ পাবে এবং যে কেহ অসৎ সুপারিশ করবে সেও ওর অংশ প্রাপ্ত হবে; এবং আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।

৪৫. مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ^ط وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

৮৬। আর যখন তোমরা শুভাশীষে সম্ভাষিত হও তখন তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

৪৬. وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

৮৭। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নেই; নিশ্চয়ই এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন; এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়ণ?

৪৭. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ^ج لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ^ط وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জিহাদ করার আদেশ করেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন নিজেই আল্লাহ তা‘আলার পথে যুদ্ধ করেন, যদিও কেহ তাঁর সাথে যোগ না দেয়। আবু ইসহাক (রহঃ) বারা’ ইব্ন আযিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘যদি কোন মুসলিম একাই থাকে এবং শত্রুরা একশ’ জন হয় তাহলে কি মুসলিমটি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে?’ তিনি বললেন : হ্যাঁ।

তখন আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন : কিন্তু কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত দ্বারা এর নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

এবং তোমরা স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুলাইমান ইব্ন দাউদ (রহঃ) থেকে বলেন, আবু বাকর ইব্ন আযাশ (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল বারা’কে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম : যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের রক্ষা বুহে ঢুকে আক্রমণ চালায় তাহলে সে কি নিজকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন : না, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, **فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমার নিজের ছাড়া অন্যের কোন দায়িত্ব তোমার উপর অর্পন করা হয়নি। (আহমাদ ৪/২৮১)

মু‘মিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে

এরপর বলা হচ্ছে : **وَحَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ** অর্থাৎ মু‘মিনদের মধ্যে সাহস জাগিয়ে তোলা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের ব্যুহ ঠিক করতে করতে বলেন :

‘তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাও যার প্রস্থ হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান।’ (মুসলিম ৩/১৫১০) জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার বহু হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দেয় এবং রামাযানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহর উপর (তার) এ হুক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে আল্লাহর পথে হিজরাতই করুক বা স্বীয় জন্মভূমিতে বসেই থাকুক।’ তখন সাহাবীগণ বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা লোকদেরকে কি এ শুভ সংবাদ শুনিয়ে দিবনা?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন :

‘জেনে রেখ! জান্নাতের একশটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যেগুলির মধ্যে এক একটি শ্রেণীর উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান। এ শ্রেণীগুলি আল্লাহ তা‘আলা ঐ লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। অতএব তোমরা জান্নাত যাপণ করলে ফিরদাউস জান্নাত যাপণ কর। ওটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওর উপরই রাহমানের আরশ রয়েছে এবং ওটা হতেই জান্নাতের নদীগুলি প্রবাহিত হয়।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৪) উবাদাহ (রাঃ) (তিরমিযী ৭/২৩৭) মুয়ায (রাঃ) (ইবন মাজাহ ২/১৪৪৮) এবং আবু দারদা (রাঃ) হতে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু রূপে, ইসলামকে ধর্ম রূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল ও নাবী রূপে মেনে নিতে সম্মত হয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।’ এতে আবু সাঈদ (রাঃ) বিস্মিত হয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পুনরাবৃত্তি করুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ওটি বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন : ‘আর একটি আমল রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার দরজা একশ’ গুণ উঁচু করে দেন। এক দরজা হতে অন্য দরজার উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান।’ তিনি জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ আমলটি কি?’ তিনি বলেন : ‘আল্লাহর পথে জিহাদ।’ (মুসলিম ৩/১৫০১) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا

হে নাবী! যখন তুমি জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবে তখন মুসলিমরাও তোমার শিক্ষার কারণে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হবে এবং আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সঙ্গেই থাকবে। সত্ত্বরই আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন, তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে। অতএব তারা তোমাদের মুকাবিলায় আসতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা‘আলা সংগ্রামে সুদৃঢ় এবং তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানকারী। তিনি এরূপ সক্ষম যে,

দুনিয়ায়ও তাদেরকে পরাজিত করবেন ও শাস্তি দিবেন এবং অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাঁরই হাতে ক্ষমতা থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪)

উত্তম ও নিকৃষ্ট সুপারিশকারীদের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার

এরপর বলা হচ্ছে : **يَمْ شَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا** যে কেহ উত্তম সুপারিশ করবে সে ওটা হতে অংশ প্রাপ্ত হবে এবং যে কেহ নিকৃষ্ট সুপারিশ করবে সেও ওটা হতে অংশ পাবে। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা চাবেন স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তা জারী করবেন।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৫১)

মুজাহিদ ইব্ন যাবর (রহঃ) বলেন : এই আয়াতটিতে কিয়ামাত দিবসে লোকদের এক জনের পক্ষে অপর জনের সুপারিশ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ৮/৫৮১) আল্লাহ তা‘আলা এত দয়ালু যে, শুধু সুপারিশ করলেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। সে সুপারিশে কাজ হোক আর নাই হোক। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক জিনিসের রক্ষক এবং প্রতিটি জিনিসের উপর খেয়াল রাখেন। তিনি সকলের হিসাব গ্রহণকারী। তিনি সবার উপর ক্ষমতাবান। প্রতিটি প্রাণীর তিনি আহার দাতা এবং প্রত্যেক মানুষের কার্যাবলীর পরিমাপ গ্রহণকারী।

সালাম প্রদানকারীর জবাব দিতে হবে উত্তম শব্দ দ্বারা

এরপর বলা হচ্ছে : **وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا** হে মু‘মিনগণ! যখন তোমাদেরকে কেহ সালাম করে তখন তোমরা তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্যে তার সালামের উত্তর দাও, অথবা তদ্রূপ শব্দই বলে দাও।’ সুতরাং তার অপেক্ষা উত্তম শব্দে উত্তর দেয়া উত্তম এবং তার অনুরূপ শব্দে উত্তর দেয়া ফার্ষ।

মুসনাদ আহমাদে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে ‘আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ’ বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়ে বললেন : সে দশটি সাওয়াব পেল; দ্বিতীয় একজন এসে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ’ বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘সে বিশটি সাওয়াব পেল।’ তৃতীয় একজন এসে বলে : ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’। তিনি বললেন : ‘সে ত্রিশটি সাওয়াব লাভ করল।’ (আহমাদ ৪/৪৩৯, আবু দাউদ ৫/৩৭৯, তিরমিযী ৭/৪৬৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, ‘তার সালামের চেয়ে উত্তম উত্তর দিবে এবং যদি ঐ মুসলিম সালামের সমস্ত শব্দই বলে দেয় তাহলে উত্তরদাতাকে ওটাই ফিরিয়ে দিতে হবে।’ যিস্মীদেরকে নিজে সালাম দেয়া ঠিক নয়। তবে সে যদি সালাম দেয় তাহলে তার শব্দেই উত্তর দিতে হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন কোন ইয়াহুদী সালাম করে তখন খেয়াল রেখ, কেননা তাদের কেহ ‘আসসালামু আলাইকা’ বলে থাকে, তখন তোমরা ‘ওয়া আলাইকা’ বলবে।’ (ফাতহুল বারী ১২/২৯৩, মুসলিম ৪/১৭০৬)

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ইয়াহুদী ও খৃষ্টানকে তোমরা প্রথমে সালাম করনা। পথে যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতার দিকে যেতে বাধ্য কর।’ (মুসলিম ৪/১৭০৭)

সুনান আবু দাউদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিবনা যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসা স্থাপিত হবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে।’ (আবু দাউদ ৫/৩৭৮)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় তাওহীদের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ইবাদাতের যোগ্য যে তিনি একাই তা প্রকাশ করছেন। শপথও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি হচ্ছে, তিনি পূর্বের ও পরের সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং সকলকেই তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। আর কথায় আল্লাহ তা‘আলা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? অর্থাৎ কেহই নেই। তাঁর সংবাদ, তাঁর অঙ্গীকার এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন সবই সত্য। ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া পালনকর্তা কেহ নেই।

৮৮। অনন্তর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হলে? এবং তারা যা অর্জন করেছে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কি তাকে পথ প্রদর্শন করতে চাও? এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা।

۸۸. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

৮৯। তারা ইচ্ছা করে যে, তারা যে রূপ কাফির তোমরাও যেন তদ্রূপ কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরাও তাদের সদৃশ হও। অতএব তাদের মধ্য হতে বন্ধু গ্রহণ করনা, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে; অতঃপর যদি তারা প্রতিগমন করে তাহলে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও তাদেরকে হত্যা কর; এবং তাদের মধ্য হতে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ করনা।

۸۹. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۚ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ۖ وَحَدِّثْهُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

৯০। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ

۹۰. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ

সম্প্রদায়ের সাথে যারা
সম্মিলিত হয়, অথবা
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে
সংকুচিত চিত্ত হয়ে যারা
তোমাদের নিকট উপস্থিত
হয়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা
করতেন তাহলে তোমাদের
উপর তাদেরকে শক্তিশালী
করতেন। তাহলে নিশ্চয়ই
তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ
করত। অতঃপর যদি তারা
তোমাদের দিক হতে সন্ধি
প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ
তাদের প্রতিকূলে তোমাদের
জন্য কোন পছন্দ রাখেননি।

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ
جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ أَعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سَبِيلًا

৯১। অচিরেই তুমি এরূপও
প্রাপ্ত হবে, যারা তোমাদের
দিক হতে ও স্বীয় সম্প্রদায়
হতে শান্তির সাথে থাকতে
ইচ্ছা করে, যখন তাদের
বিরোধের প্রতি প্রলুব্ধ করানো
হয় তখন তাতেই নিপতিত
হয়; অনন্তর যদি তোমাদের
দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও
সন্ধি প্রার্থনা না করে এবং
তাদের হস্তসমূহ সংযত না
করে তাহলে তাদেরকে

৯১. سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا
قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ
أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَرِلُوكُمْ
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ وَيَكْفُوا
أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ

পাকড়াও কর এবং যেখানে
পাও তাদেরকে সংহার কর;
এদেরই জন্য আল্লাহ
তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি
প্রমাণ দান করেছেন।

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا
مُّبِينًا

উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত

মুনাফিকদের কোন ব্যাপারে যে মুসলিমদের দু' প্রকার মত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উহুদ প্রান্তরে গমন করেন তখন তাঁর সাথে মুনাফিকরাও ছিল। তারা যুদ্ধের পূর্বেই ফিরে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে কতক মুসলিম বলছিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করা উচিত। আবার অন্য কয়েকজন বলছিলেন যে, হত্যা করা হবেনা, কেননা তারাও মু'মিন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘এটি পবিত্র শহর, এটি নিজেই মালিন্য এমনভাবে দূর করে দিবে যেমনভাবে আগুনের চুল্লি লোহাকে পরিষ্কার করে’। (ফাতহুল বারী ৪/১১৫, মুসলিম ২/১০০৭)

আল আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মাক্কায় এমন কতগুলি লোক ছিল যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল। কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করত। তারা নিজেদের কোন বিশেষ প্রয়োজনে মাক্কা হতে বের হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাদেরকে কোন বাধা প্রদান করবেননা। কেননা প্রকাশ্যে তারা কালেমা পাঠ করেছিল।

মাদীনার মুসলিমগণ যখন এ সংবাদ জানতে পারেন তখন তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন : ‘এ কাপুরুষদের সাথে প্রথমে জিহাদ করা হোক। কেননা এরা আমাদের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষক।’ কিন্তু কতক লোক বলেন, ‘সুবহানাল্লাহ! যারা আমাদের মতই কালেমা পড়ে তোমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে? শুধু এ কারণে যে, তারা হিজরাত করেনি এবং নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়েনি? আমরা কিভাবে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল করতে পারি?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাদের এ মতানৈক্য হয়েছিল। তিনি নীরব ছিলেন। সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০) তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا

অন্তরে যখন তোমাদের প্রতি এত শত্রুতা রয়েছে তখন তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত তারা হিজরাত না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে নিজের মনে করনা। তোমরা এটা মনে করনা যে, তারা তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। বরং তারা নিজেরাই এর যোগ্য যে, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে।

যুদ্ধ ও সন্ধি

অতঃপর ওদের মধ্য হতে ঐ লোকদেরকে পৃথক করা হচ্ছে যারা এমন কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে চলে যায় যাদের সঙ্গে মুসলিমদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে। তখন তাদের হুকুম সন্ধিযুক্ত সম্প্রদায়ের মতই হবে। ইমাম সুদী (রহঃ), ইব্ন যায়দ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ৯/১৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে হুদাইবিয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, যারা কুরাইশদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চায় এবং আঁতাত গড়ে তুলতে চায় তাদেরকে সেই অনুমতি দেয়া হল। অন্যদিকে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে শান্তি স্থাপন করতে চায় এবং আঁতাত করতে চায় তাদেরকেও সেই অনুমতি দেয়া হল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮, আহমাদ ৪/৩২৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি পরবর্তী সময় নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৫) (তাবারী ৯/১৮) এরপর অন্য একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় বটে, কিন্তু তারা সংকুচিত চিত্ত হয়ে হাযির হয়। তারা না তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, আর না তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা পছন্দ করে। বরং তারা তৃতীয় পক্ষীয় লোক। তাদেরকে না তোমাদের শত্রু বলা যেতে পারে, না বন্ধু বলা যেতে পারে। সুতরাং এটাও আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে

তোমাদের উপর শক্তিশালী করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতা দান করতেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্পৃহা তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতেন। সুতরাং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে তাহলে তোমাদের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি নেই।

বদরের যুদ্ধে বানু হাশিম গোত্রের কতগুলো লোক মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছিল। যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্তরে অপছন্দ করেছিল, তারাই ছিল এ প্রকারের লোক। যেমন আব্বাস (রাঃ) ইত্যাদি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে থাকা আব্বাসকে (রাঃ) হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাকে জীবিত গ্রেফতার করতে বলেছিলেন।

অতঃপর আর একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা বাহ্যতঃ উপরোক্ত দলের মতই। কিন্তু তাদের নিয়াত খুবই কুণ্ঠিত, তারা মুনাফিক। এ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম প্রকাশ করে স্বীয় জান-মাল মুসলিমের হাত হতে রক্ষা করত, আর ওদিকে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের বাতিল মা’বুদের ইবাদাত করত এবং তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করে তাদের সাথেই মিলেমিশে থাকত যেন তাদের নিকটেও নিরাপদে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল কাফির। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا

إِنَّا مَعَكُمْ

এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলে : আমরা তোমাদের সাথেই আছি। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪) এখানেও বলা হচ্ছে, যখন তারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন তাতেই নিপতিত হয়। এখানেও **فتنة** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শিরক। (তাবারী ৯/২৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলোও মাক্কাবাসী ছিল। এখানে এসে তারা রিয়াকারী রূপে ইসলাম গ্রহণ করত এবং মাক্কায় ফিরে গিয়ে মূর্তিপূজা করত। তাই তাদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : যদি তারা তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে তাহলে তাদেরকে

নিরাপত্তা দান করনা, বরং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (তাবারী ৯/২৭) তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করেছেন।

৯২। কোন মু'মিনের উচিত নয় যে, ভ্রম ব্যতীত কোন মু'মিনকে হত্যা করে; যে কেহ ভ্রম বশতঃ কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে সে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করে দিবে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে হত্যার বিনিময় সমর্পণ করবে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় এবং যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মু'মিন হয় তাহলে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্তি দান করবে; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তাহলে তার স্বজনদেরকে হত্যার বিনিময় অর্পণ করবে এবং জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করবে; কিন্তু যদি সে ওটায় অক্ষম হয় তাহলে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

৯২. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

৯৩। আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম, তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

۹۳. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

ভুলক্রমে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে উহার প্রতিবিধান

ইরশাদ হচ্ছে : ‘কোন মু’মিনের উচিত নয় যে, সে তার কোন মু’মিন ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।’ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা’আলা ছাড়া কেহ মা’বুদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে (হত্যা করা বৈধ)। (১) কেহকে হত্যা করলে, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলে।’ (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২) এ তিনটির যে কোন একটি কাজ কারও দ্বারা সংঘটিত হলে নাগরিকদের মধ্যে কারও তাকে হত্যা করার অধিকার নেই, বরং এটা হচ্ছে মুসলিম ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির অধিকার। এরপরে **اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ** রয়েছে এবং এটা হচ্ছে **الْأَخْطَا**

এ আয়াতের শান-ই নুযূলে মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে একটি উক্তি এই বর্ণিত আছে যে, এটা আবু জাহলের বৈপিণ্ডেয় ভাই আইয়াশ ইব্ন আবু রাবী‘আহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার মায়ের নাম আসমা বিনতে মাখরামাহ। আইয়াশ (রাঃ) একটি লোককে হত্যা করেছিলেন। লোকটির নাম ছিল হার্স ইব্ন ইয়াযীদ আল আমিরী। আইয়াশ (রাঃ) এবং তার ভাই ইসলাম ধর্ম কবুল করেছিলেন বলে আবু জাহলের সঙ্গে হার্স ইব্ন ইয়াযীদ যোগ দিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে শাস্তি প্রদান করেছিল। ফলে তিনি মনে সংকল্প করেন যে, সুযোগ পেলেই হার্স ইব্ন ইয়াযীদকে হত্যা করবেন। কিছু

দিন পর হার্সও মুসলিম হয়ে যায় এবং হিজরাতও করে। কিন্তু আইয়াশ (রাঃ) এ খবর জানতেননা। মাক্কা বিজয়ের দিন সে তার চোখে পড়ে যায় এবং এখনও সে কুফরীর উপরই রয়েছে এই মনে করে হঠাৎ তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/৩২)

অন্য উক্তি এই যে, আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি আবু দারদার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, তিনি একজন কাফিরের উপর তরবারী উঠিয়েছেন এমন সময় সে ঈমানের কালেমা পাঠ করে। কিন্তু আবু দারদা (রাঃ) তার উপর তরবারী বসিয়েই দেন এবং লোকটি নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে আবু দারদা (রাঃ) বলেন, ‘সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছিল।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?’ (তাবারী ৯/৩৪) এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসেও রয়েছে, কিন্তু সেখানে অন্য সাহাবীর নাম রয়েছে।

অতঃপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কোন মুসলিম যদি অপর কোন মুসলিমকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করে তাহলে দু’টি জিনিস ওয়াজিব হবে। প্রথম হচ্ছে একটি দাসকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা-বিনিময় প্রদান করা। ঐ দাসের ব্যাপারে আবার শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মু’মিন। কাফির দাসকে মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবেনা এবং ছোট নাবালক দাসও যথেষ্ট হবেনা যে পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়নের মত বয়স প্রাপ্ত না হবে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) কৃষ্ণ বর্ণের একটি দাসী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি মুসলিম দাস বা দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। যদি এ দাসীটিকে আপনি মুসলিম মনে করেন তাহলে আমি তাকে মুক্ত করে দিব’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঐ দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই?’ সে বলে : ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেন : ‘তুমি কি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?’ সে বলে, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেন : ‘মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি?’ সে বলে, ‘হ্যাঁ’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আনসারীকে বলেন : ‘তাকে আযাদ করে দাও।’ (আহমাদ ৩/৪৫১) এ হাদীসের ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং ঐ সাহাবী কে ছিলেন তা গুপ্ত থাকা সনদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব যা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার হত্যার বিনিময়। এ রক্তপণ হচ্ছে পাঁচ প্রকারের একশ'টি উট, যথা (১) বয়স প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (২) এ বয়সেরই বিশটি উষ্ট্র। (৩) দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৪) তৃতীয় বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৫) চতুর্থ বছর পেরিয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। এটাই হচ্ছে ভ্রমে হত্যার বিনিময় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাইসালা করেছেন। (আবু দাউদ ৪৫৪৫, তিরমিযী ১৩৮৬, নাসাঈ ৪৭৯৯, ইব্ন মাজাহ ৩৬৩১, আহমাদ ১/৩৮৪)

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। এ রক্তপণ হত্যাকারীর 'আকেলার' উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার হত্যাকারীর বংশের প্রতিনিধিত্বকারীর উপর ওয়াজিব হবে, তার নিজের অর্থ থেকে নয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযাইল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে একটি পাথর মেরে দেয়। সে গর্ভবতী ছিল। সন্তানও নষ্ট হয়ে যায় এবং সেও মারা যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বর্ণিত হলে তিনি ফাইসালা দেন যে, এ শিশুর রক্তপণ হচ্ছে একটি প্রাণ, দাস বা দাসী এবং ঐ নিহত মহিলার রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারিণীর বংশের যে মুরুব্বী থাকবে তার উপর। (ফাতহুল বারী ১২/২৬৩, মুসলিম ৩/১৩০৯) এর দ্বারা এও জানা গেল যে, যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ভুল বশতঃ হয়ে যায়, রক্তপণ হিসাবে তার হুকুম শুধু ভুল বশতঃ হত্যার মতই। কিন্তু প্রথমক্ত অবস্থায় দিয়াত হবে তিন ধরণের। কেননা সেখানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে (রাঃ) একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খুযাইমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করল বটে, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ **أَسْلَمْنَا** অর্থাৎ 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম'-এ কথা বলার

পরিবর্তে **صَبَّأْنَا** অর্থাৎ 'আমরা বেদীন হয়ে গেলাম' এ কথা বলল। খালিদ (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে

আরয করেন : ‘হে আল্লাহ! আমি খালিদের (রাঃ) এ কাজে আপনার নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করছি এবং নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৫৩)

অতঃপর তিনি আলীকে (রাঃ) খুযাইমা গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাদের নিহতদের রক্তপণ এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এমনকি তাদের কুকুরকে খাওয়ানো পাত্রটিরও ক্ষতিপূরণ দেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইমাম বা তার প্রতিনিধির ভুলের বোঝা বাইতুলমালকেই বহন করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘রক্তপণ ওয়াজিব বটে, কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা করার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা ওটা সাদাকাহ হিসাবে ক্ষমা করে দিতে পারে।’ এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির হয় তাহলে হত্যাকারীর দায়িত্বে রক্তপণ নেই। ঐ অবস্থায় তাকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তির অলী ও উত্তরাধিকারী এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে, তাহলে রক্তপণ আদায় করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি কাফির হয় তাহলে কারও মতে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারও মতে অর্ধেক দিতে হবে এবং কারও মতে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আহকামের পুস্তক-গুলিতে দ্রষ্টব্য। হত্যাকারীকে একজন মু‘মিন গোলামও আযাদ করতে হবে। দারিদ্রতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে ক্রমাগত দুই মাস সিয়াম পালন করতে হবে। রোগ, হায়েয, নিফাস ইত্যাদির মত কোন শারীয়াত সম্মত ওযর ছাড়াই মধ্যে কোন একদিন যদি সিয়াম ছেড়ে দেয় তাহলে আবার নতুনভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে। সফরের ব্যাপারে দু’টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটাও একটি শারীয়াত সমর্থিত ওযর। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এটা শারীয়াত সমর্থিত ওযর নয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হতে সাবধান

ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনার পর এখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর কঠিন ভীতিযুক্ত শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এটা এমন একটা পাপ যাকে শিরকের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮) অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছে :

أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ عَلَّيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা হারামকৃত কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শির্ক ও হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম রক্তের ফাইসালা করা হবে।' (ফাতহুল বারী ১১/৪০২, মুসলিম ৩/১৩০৪)

সুনান আবু দাউদে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মু'মিন সাওয়াবে ও মঙ্গলে এগিয়ে চলে যে পর্যন্ত না সে অন্যায়ভাবে কেহকে হত্যা করে। যখন সে এটা করে তখন সে ধ্বংস হয়ে যায়।' (আবু দাউদ ৪২৭০) অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সারা জগতের পতন একজন মুসলিমের হত্যা অপেক্ষা হালকা। (তিরমিযী ৪/৬৫২)

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তাওবাহ কি কবুল হবে?

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি তো এই যে, যে ব্যক্তি মু'মিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার তাওবাহ কবুলই হয়না। কুফাবাসী এ মাসআলায় মতভেদ করলে ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি এ আয়াতটি (৪ : ৯৩) পাঠ করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে এ আয়াতটিই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত এবং এটি অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়নি। (ফাতহুল বারী ৮/১০৬, মুসলিম ৪/২৩১৮, নাসাই ৬/৩২৬) বেশীর ভাগ আলেম এবং তাদের পরবর্তীগণ বলেন যে, হত্যাকারীর অনুশোচনা/তাওবাহ গ্রহণযোগ্য।

অতএব যখন কোন লোক ইসলামের অবস্থায় শারীয়াত সমর্থিত কারণ ছাড়াই কোন মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম এবং তার তাওবাহ গ্রহণীয় হবেনা।

অতএব একটি মতামত তো হল এই যে, জেনে-শুনে হত্যাকারীর তাওবাহ গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় অভিমত এই যে, তাওবাহ তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনের অভিমত এটাই যে, সে যদি তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, বিনয় প্রকাশ করে এবং সংকার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ গ্রহণ করবেন এবং নিহত ব্যক্তিকে স্বীয় পক্ষ হতে বিনিময় প্রদান করে সন্তুষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮-৭০)

এখানে যে আয়াতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তা না মানসুখ বা বাতিল করা হয়েছে, আর না শুধু ঐ অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে (যারা পরে মুসলিম হয়েছে)। কারণ ইহা আয়াতের সাধারণ অর্থের প্রকাশ্য বিপরীত, যা সাব্যস্ত করতে দলীল প্রমাণের প্রয়োজন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

বল : (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩) এ আয়াতটি সাধারণ। সুতরাং কুফরী, শির্ক, নিফাক, হত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার

দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

(৪ : ৪৮) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা শির্ক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পাপ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। এটা তাঁর একটি বড় অনুকম্পা যে, তিনি এ সূরার মধ্যেই এখন আমরা যে আয়াতের তাফসীর করছি এর পূর্বে একবার স্বীয় সাধারণ ক্ষমার আয়াত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের পরই অনুরূপভাবে স্বীয় সাধারণ ক্ষমার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন যেন আশা দৃঢ় হয়।

এখানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন লোক একশ'টি লোককে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার তাওবাহ গৃহীত হবে কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'তোমার মধ্যে ও তোমার তাওবাহর মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হবে?' অতঃপর তিনি তাকে পবিত্র শহরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে বলেন। অতএব সে ঐ শহরে হিজরাতের উদ্দেশে বের হয়। পথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং রাহমাতের মালাক/ফেরেশতা এসে তাকে নিয়ে যান। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮) এ হাদীসটিকে পূর্ণভাবে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। বানী ইসরাঈলের মধ্যেই যখন ক্ষমার এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমাদের মধ্যে তো সে ক্ষমার ব্যবস্থা বহু গুণ বেশি থাকা উচিত। কেননা বানী ইসরাঈল এমন বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে মুক্ত রেখেছেন। আর তিনি বিশ্ব শান্তির দূত ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে এমন ধর্ম আমাদেরকে দান করেছেন যা আকাশেও শান্তিদায়ক এবং পৃথিবীতেও শান্তিদায়ক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার ধর্ম। কাজেই এখানে হত্যাকারীর তাওবাহর দরজা বন্ধ হবে কেন?

তবে এখানে হত্যাকারীর যে শান্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই যে, তার শান্তি হচ্ছে এই যদি আল্লাহ তা'আলা শান্তি দেন। যেমন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দল এ কথাই বলেন।

শান্তির ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও উত্তম পন্থা এটাই। সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আর হত্যাকারীর জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য যে, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবেন। তার জাহান্নামী

হওয়া ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে তাওবাহ গৃহীত না হওয়ার কারণেই হোক অথবা বিজ্ঞজনের উক্তি অনুযায়ী ওর পিছনে কোন সৎকাজ না থাকার কারণেই হোক।

এখানে خُلُود শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বহুদিন অবস্থান, চিরদিন অবস্থান নয়। যেমন হাদীস-ই-মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। (বুখারী ৪৪, ৭৫০৯; তিরমিযী ২৫৯৮)

৯৪। হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে বহির্গত হও তখন প্রত্যেক কাজ যাচাই করে নাও, এবং কেহ তোমাদেরকে 'সালাম' করলে তাকে বলনা যে, 'তুমি মু'মিন নও'; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছ? তাহলে আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা স্থির করে নাও যে, তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

۹۴. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْۤا وَّلَا تَقُوْلُوْۤا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنۢ قَبْلُ فَمَنْۢ بَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْۤا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামের অংশ

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানু সালীম গোত্রের একটি লোক ছাগল চরাতে চরাতে সাহাবায়ে কিরামের একটি দলের পাশ দিয়ে গমন করে এবং তাদেরকে সালাম দেয়। তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন : এ লোকটি মুসলিম তো নয়, শুধু জীবন রক্ষার উদ্দেশে সালাম করছে। অতএব তারা তাকে হত্যা করে ছাগলগুলো নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসেন। সে সময়ই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ১/২৭২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উসামাহ ইব্ন যায়িদও (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, এটি সহীহায়িনের শর্তে সঠিক, তবে তারা তাদের কিতাবে এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (তিরমিযী ৮/৩৮৬, হাকিম ২/২৩৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতটি সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, ‘এক লোক মাঠে ভেড়া চরাচ্ছিলেন, কিছু মুসলিম তাকে আটক করলে ঐ লোকটি বলল : ‘আসসালামু আলাইকুম।’ কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল এবং তার ভেড়াগুলি নিয়ে নিল। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাকা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবী হাদরাদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আবী হাদরাদ (রাঃ) বলেছেন : একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ‘ইদাম’ নামক স্থানে প্রেরণ করেন। আমরা বাহনে চড়ে মুসলিমদের একটি দল বেড়িয়ে পড়লাম, যাদের মধ্যে ছিলেন আবু কাতাদাহ (রাঃ) হারিস ইব্ন রাবঈ (রাঃ) এবং মুহলিম ইব্ন জাসামা ইব্ন কায়েস। আমরা বাতনে ইয়ম্মে পৌঁছলে আমর ইব্ন আযবাত আশজাঈ উটে চড়ে সেখান দিয়ে গমন করেন। তাঁর সাথে বহু আসবাবপত্র ছিল। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় তিনি আমাদেরকে সালাম দেন। তখন আমরা তাঁকে হত্যা করা হতে বিরত থাকি। কিন্তু মুহলিম ইব্ন জাসামা তাঁকে পারস্পরিক বিবাদের ভিত্তিতে হত্যা করে এবং তার উট ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৬/১১)

সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মুআল্লাক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদকে (রাঃ) বলেন : ‘যখন একজন মু’মিন কাফির সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল, অতঃপর

সে তার ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মাক্কায়ে এরূপই তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে’।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সংক্ষিপ্ত হাদীসটি বর্ণনার ধারাবাহিকতা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ৬৮৬৬) তিনি অবশ্য অন্যত্র বর্ণনার পূর্ণ ধারাবাহিকতাসহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবু বাকর আল বায্যার (রাঃ) ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : মিকদাদ ইবন আসওয়াদের (রাঃ) নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর তারা দেখতে পান যে, সেখানকার লোকেরা এদিক ওদিক পালিয়ে গেছে। শুধু একটি লোক রয়ে যায় যার নিকট বহু সম্পদ ছিল। সে তাদেরকে দেখামাত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা’বুদ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিকদাদ (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন। তখন তার সঙ্গীদের এক ব্যক্তি তাকে বলেন : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই’ তাকে তুমি হত্যা করলে? আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করব।’ অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, তাকে মিকদাদ (রাঃ) হত্যা করেছেন’। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘তোমরা মিকদাদকে (রাঃ) আমার নিকট ডেকে আন।’ (তিনি এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন) : ‘হে মিকদাদ! তুমি এমন এক লোককে হত্যা করলে যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করেছিল? কিয়ামাতের দিন তুমি এ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সামনে কি করবে?’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি (৪ : ৯৪) অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হে মিকদাদ! সে ছিল একজন ঈমানদার ব্যক্তি যে কাফিরদের ভয়ে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল। তোমাদের দেখতে পেয়ে সে তার ঈমানকে প্রকাশ করেছে, অথচ তোমরা তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মাক্কায়ে অবস্থান করার সময় তোমাদের ঈমান প্রকাশ করা হতে বিরত থাকতে। (মাজমা আয যাওয়ায়িদ ৭/৯)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রচুর গানীমাত রয়েছে’। অর্থাৎ গানীমাতের লোভে তোমরা এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করছ এবং ইসলাম প্রকাশকারীকেও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করছ।

তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ গানীমাতও রয়েছে এবং তা তাঁর নিকট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেগুলি তিনি তোমাদেরকে হালাল উপায়ে প্রদান করবেন। ওটা তোমাদের জন্য এ সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। তোমরা তোমাদের ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরাও এরূপ ছিলে। তখন তোমরাও দুর্বলতার কারণে তোমাদের ঈমান প্রকাশ করার সাহস করনি। তোমরা তোমাদের কাওমের মধ্যে গোপনে চলাফিরা করতে। আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আজ তিনি তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন বলেই তোমরা খোলাখুলি ইসলাম প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছ। তবে আজও যারা শত্রুদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রয়েছে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করতে পারছেননা, তারা যদি তোমাদের সামনে তাদের ইসলাম প্রকাশ করে তাহলে তা মনে নিতে হবে। যেমন তিনি বলেন :

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ

তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৬) মোট কথা, ইরশাদ হচ্ছে যে, যেমন এ লোকটি স্বীয় ঈমান গোপন রেখেছিল তদ্রূপ তোমরাও ইতোপূর্বে সংখ্যায় অল্প ছিলে, তোমাদের শক্তিও কম ছিল, কাজেই তোমরাও তখন মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে। (আবদুর রাযযাক ১/১৭০) অতঃপর ধমক দেয়া হচ্ছে :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 'আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে উদাসীন মনে করনা। তোমরা যা কিছু করছ তার তিনি পূর্ণ খবর রাখছেন'।

৯৫। মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর

۹۵. لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ

উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধা - গণকে (মুজাহিদ) মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন।

الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا

৯৬। স্বীয় সন্নিধান হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুনা (দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন) এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

۹۶. دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً
وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

যারা জিহাদে অংশ নেয় এবং যারা অংশ নেয়না তারা উভয়ে সমান নয়

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, বারা' (রাঃ) বলেন যে, যখন এ আয়াতের প্রাথমিক শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়, 'গৃহে উপবিষ্টগণ ও ধর্মযোদ্ধাগণ সমান নয়' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদকে (রাঃ) ডেকে তা লিখিয়ে নিচ্ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী উম্মে মাকতূম (রাঃ) উপস্থিত হন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো অন্ধ।' তখন غَيْرُ

أُولَى الضَّرَرِ 'কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীত' এ অংশটুকু অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮) অর্থাৎ ঐ উপবিষ্টগণ সমান নয় যারা বিনা ওয়রে গৃহে উপবিষ্ট থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যায়িদ (রাঃ) স্বীয় দোয়াত, কলম ও কালি নিয়ে এসেছিলেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমার ক্ষমতা থাকত

তাহলে আমি অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম।’ তখন **غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ** এ শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উরু যায়িদের (রাঃ) উপর ছিল। যায়িদের (রাঃ) উরুর উপর এত চাপ পড়ছিল যে, তিনি মনে করছিলেন যেন তা ভেঙ্গেই যাবে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধে অনুপস্থিতদেরকে বুঝানো হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা দু’জন তো অন্ধ। আমাদের জন্য অবকাশ রয়েছে কি?’ তখন তাদেরকে কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতের মাধ্যমে অবকাশ দেয়া হয়। (তিরমিযী ৮/৩৮৮) সুতরাং মুজাহিদগণকে যে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন ঐসব লোক যারা সুস্থ ও সবল। প্রথমে মুজাহিদগণকে সাধারণভাবে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। অতঃপর **غَيْرُ أُولَى**

الضَّرَرِ এ শব্দগুলি অবতীর্ণ করে যাদের শারীয়াত সমর্থিত ওয়র রয়েছে, তাদেরকে সাধারণ উপবিষ্টগণ হতে পৃথক করা হয়। যেমন অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন ইত্যাদি। এসব লোক মুজাহিদগণেরই শ্রেণীভুক্ত। অতঃপর মুজাহিদগণের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ওটাও ঐসব লোকের উপর, যারা বিনা কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনা। যেমন ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা হওয়াই উচিতও বটে। সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘মাদীনায অবস্থান করছে এমন কতক লোকও রয়েছে যে, তোমরা যে যুদ্ধের সফর কর এবং যে জঙ্গল অতিক্রম কর, তারা সাওয়াবে তোমাদের সমান। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ‘যদিও তারা মাদীনাযই অবস্থান করেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘হ্যাঁ, কেননা ওয়র তাদেরকে বাধা দিয়ে রেখেছে।’ (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى সকলকেই আল্লাহ তা‘আলা কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, জিহাদ ফারযে আইন (সকলের অংশ নেয়া) নয়, বরং ফরযে কিফায়া। তারপরে ইরশাদ হচ্ছে, ‘বাড়ীতে উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদগণের বড়ই মর্যাদা রয়েছে।’ অতঃপর আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উচ্চ পদ-মর্যাদা, তাদের পাপ ক্ষমা করণ এবং তাদের উপর যে করুণা ও অনুগ্রহ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর স্বীয় সাধারণ ক্ষমা ও সাধারণ দয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘জান্নাতের একশ’টি স্তর রয়েছে যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক স্তরের মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে।’ (মুসলিম ৩/১৫০১)

৯৭। যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, মালাক/ ফেরেশতা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে : তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম; তারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা যে, তন্মধ্যে তোমরা হিজরাত করতে? অতএব ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট ঐ জায়গা!

৯৭. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

৯৮। কিন্তু পুরুষ, নারী এবং শিশুদের মধ্যে অসহায়তা বশতঃ যারা কোন উপায় করতে পারেনা অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয়না।

৯৮. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

<p>৯৯। ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।</p>	<p>۹۹. فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا</p>
<p>১০০। আর যে কেহ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। এবং যে কেহ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও রাসুলের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করে, অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত রয়েছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।</p>	<p>۱۰۰. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ ۚ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا</p>

হিজরাত করার সুযোগ থাকলে কাফিরদের সাথে বসবাস করা নিষিদ্ধ

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রাহমান আবু আসওয়াদ (রহঃ) থেকে ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : মাদীনাবাসীদেরকে জোরপূর্বক যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল (মাক্কার খলিফা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের শাসনামলে সিরিয়ার লোকদের বিরুদ্ধে) তখন আমাকেও ঐ বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

আমি তখন ইকরিমাহর (রহঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে এ কথাটি তাকে বলি। তিনি আমাকে এতে অংশগ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, ‘আমি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেসব মুসলিম মুশরিকদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল, মাঝে মাঝে এমনও হত যে, তাদের কেহ কেহ মুসলিমদেরই তীরের আঘাতে নিহত হত

বা তাদেরই তরবারী দ্বারা তাদেরকে হত্যা করা হত। তখন আল্লাহ তা‘আলা **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১১১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ লোক যারা তাদের মুনাফিকী গোপন রেখেছিল এবং বদরের যুদ্ধে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগ না দিয়ে মাক্কায় অবস্থান করছিল। কিন্তু তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের হাতে তাদের কয়েকজন লোক মারা যায়। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০৮)

ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হুকুম হচ্ছে সাধারণ। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যই এ হুকুম প্রযোজ্য যে হিজরাত করতে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে পড়ে থাকে এবং দীনের উপর দৃঢ় থাকেনা। সে আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যাচারী। এ আয়াতের মর্মার্থ হিসাবে এবং মুসলিমদের ইজমা হিসাবেও সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার দোষে দোষী। এ আয়াতে হিজরাত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমরা এখানে পড়ে রয়েছ কেন? কেন তোমরা হিজরাত করনি?’ তারা উত্তর দেয়, ‘আমরা নিজেদের শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যেতে সক্ষম হইনি।’ তাদের এ কথার উত্তরে মালাইকা বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা?’

মুসনাদ আবু দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথেই বাস করে সে ওর মতই।’ (আবু দাউদ ৩/২২৪) সুদী (রহঃ) বলেন যে, যখন আব্বাস (রাঃ), আকীল ও নাওফিলকে বন্দী করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাসকে (রাঃ) বলেন : ‘আপনি আপনার নিজের ও আপনার ভ্রাতৃস্পুত্রের মুক্তি পণ প্রদান করুন।’ তখন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি আপনার কিবলার দিকে সালাত আদায় করতামনা এবং আমরা কি কালেমা শাহাদাত পাঠ করতামনা?’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘হে আব্বাস! আপনারা তর্কতো উত্থাপন করেছেন, কিন্তু আপনারা পরাজিত হয়ে যাবেন। শুনুন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً** আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা? এরপর যে লোকদের হিজরাত পরিত্যাগের উপর ভরসনা নেই তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে :

وَالْوَلَدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا যারা মুশরিকদের হাত হতে ছুটতে পারেনা বা ছুটতে পারলেও হয়তো পথ চেনা নেই, তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করবেন। (তাবারী ৯/১১১) عَسَى শব্দটি আল্লাহ তা'আলার কালামে নিশ্চয়তা বোধক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাতে حَمْدُهُ বলার পর সাজদায় যাওয়ার পূর্বে দু'আ করেছেন :

‘হে আল্লাহ! আইয়াশ ইব্ন রাবীআহকে, সালাম ইব্ন হিশামকে, ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে এবং সমস্ত অসহায় ও শক্তিহীন মুসলিমকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! ‘মুযার’ গোত্রের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করুন।’ হে আল্লাহ! তাদের উপর আপনি বছরের পর বছর এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফের (আঃ) যামানায় এসেছিল।’ (বুখারী ৮০৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আমি এবং আমার মা ঐসব দুর্বল নারী ও শক্তিহীন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ওযর বিশিষ্টদের মধ্যে গণ্য করেছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/১১৩) হিজরাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং মুশরিকদের হতে পৃথক থাকার হিদায়াত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর পথে হিজরাতকারী যেন নিরাশ না হয়। তারা যেখানেই যাবে তিনি তাদের আশ্রয় লাভের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিবেন এবং তারা শান্তিতে সেখানে বসবাস করতে পারবে।

مُرَاغِم শব্দের একটি অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়াও বটে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার বহু পস্থা পেয়ে যাবে। ওর বহু আসবাবপত্র সে লাভ করবে। সে শত্রুদের অত্যাচার হতেও রক্ষা পাবে এবং তার আহ্বারেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভ্রান্তির পথের স্থলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং দারিদ্র ধনশীলতায় পরিবর্তিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ যে ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে বহির্গত হয়, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পূর্বেই পথে তার মৃত্যু এসে যায় সেও হিজরাতের পূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। সহীহায়িন, মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ কর্তৃক

বর্ণিত হয়েছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। সুতরাং যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে, তার হিজরাত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দের কারণ। আর যার হিজরাত হয় দুনিয়া লাভের উদ্দেশে বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, সে প্রকৃত হিজরাতের সাওয়াব প্রাপ্ত হবে না। বরং হিজরাত ঐ দিকেই মনে করা হবে।’ (ফাতহুল বারী ১/১৬৪, মুসলিম ৩/১৫১৫, আবু দাউদ ২/৬৫১, তিরমিযী ৫/২৮৩, নাসাঈ ৭/৭১৩, ইবন মাজাহ ২/১৪১৩, আহমাদ ১/২৫) এ হাদীসটি সাধারণ। হিজরাত ও অন্যান্য সমস্ত আমলই এর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করে। অতঃপর একজন আবেদকে হত্যা করে একশ’ পূর্ণ করে দেয়। তারপর তার তাওবাহ গৃহীত হবে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম তাকে বলেন : তোমার তাওবাহ ও তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তুমি তোমার গ্রাম হতে হিজরাত করে অমুক শহরে চলে যাও যেখানে আল্লাহ তা‘আলার আবেদগণ বাস করেন। অতএব সে হিজরাতের উদ্দেশে ঐ শহরের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। এখন করুণা ও শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। করুণার মালাইকা বলেন যে, এ ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল। পক্ষান্তরে শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলেন যে, সেখানেতো সে পৌছতে পারেনি। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় যে, এ দিকের এবং ঐ দিকের ভূমি মাপা হোক। যে গ্রাম থেকে সে হিজরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল সেই গ্রাম এবং হিজরাতের শহরের দূরত্বের মাঝখান হতে তার অবস্থান নির্ণয় করা হোক। সে যে এলাকার ভিতর থাকবে সেই এলাকার লোকদের সঙ্গেই তাকে মিলিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যমীনকে নির্দেশ দেন যে, ওটা যেন খারাপ গ্রাম হতে দূরবর্তী হয়ে যায় এবং ভাল গ্রামের নিকটবর্তী হয়। ভূমি মাপা হলে দেখা যায় যে, একাত্তাবাদীদের গ্রামটি অর্ধহাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে। ফলে তাকে করুণার মালাইকা নিয়ে যান। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় সে সৎলোকদের গ্রামের দিকে বুকের ভরে এগিয়ে যাচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮)

১০১। আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; নিশ্চয়ই কাফিরেরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০১. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

কসর সালাত

ইরশাদ হচ্ছে : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর। অর্থাৎ শহরসমূহের সফরে বের হও। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন :

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ۖ وَأَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে। (সূরা মুযাশ্শিল, ৭৩ : ২০) তাহলে সে সময় সালাত সংক্ষেপ করায় তোমাদের কোন অপরাধ নেই। অর্থাৎ চার রাকআতের স্থলে দু’রাকআত, যেমন বিজ্ঞজনেরা এ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝেছেন, যদিও তাদের মধ্যে কতক মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, সালাত সংক্ষেপ করার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত। যেমন জিহাদের জন্য, হাজ্জ বা উমরার জন্য, জ্ঞানানুসন্ধান ইত্যাদির জন্য সফর করা। ইব্ন উমার (রাঃ), ‘আতা (রহঃ) এবং ইয়াহুইয়ারও (রহঃ) উক্তি এটাই। কেননা এরপরে ঘোষণা রয়েছে : ‘যদি তোমরা আশংকা কর যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।’ কারও কারও মতে এ শর্ত আরোপের কোনই প্রয়োজন নেই যে, এ সফর আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে হতে হবে, বরং প্রত্যেক বৈধ

সফরেই সালাত সংক্ষেপ করা যায়। যেমন মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَمَنْ أَضْطَرُّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৩) তবে হ্যাঁ, শর্ত এই যে, সেটা যেন পাপ কাজের উদ্দেশে সফর না হয়।

কাফিরদের হতে ভয় করার যে শর্ত লাগানো হয়েছে তা অধিক প্রচলনের কারণেই লাগানো হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেহেতু অবস্থা প্রায় এরূপই ছিল সেহেতু আয়াতের মধ্যেও ওটা বর্ণনা করা হয়েছে। হিজরাতের পর মুসলিমদেরকে যেসব সফরে যেতে হয়েছিল তার সবগুলিই ছিল ত্রাসের সফর। প্রতি পদে পদে শত্রুর ভয় ছিল। এমনকি মুসলিমগণ জিহাদ ছাড়া এবং বিশেষ কোন সেনাবাহিনীর সঙ্গ ছাড়া সফরের জন্য বেরই হতে পারতেননা। আর নিয়ম আছে যে, অধিক হিসাবে যে কথা বলা হয় তার বোধগম্য ধর্তব্য হয়না। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন : ‘তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে নির্লজ্জ কাজে বাধ্য করা যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে।’ অন্য জায়গায় রয়েছে : ‘তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করছ তাদের ঐ মেয়েগুলিও তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের নিকট প্রতিপালিতা হচ্ছে।’ অতএব এ আয়াত দু’টিতে যেমন শর্তের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওর হওয়ার উপরই হুকুম নির্ভর করেনা, বরং এ শর্ত ছাড়াও ওটাই হুকুম। অর্থাৎ নির্লজ্জ কাজে দাসীদেরকে বাধ্য করা হারাম, তারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করুক আর না’ই করুক। অনুরূপভাবে ঐ স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কন্যাও তার স্বামীর পক্ষে হারাম যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে, তা সেই কন্যা তার স্বামীর নিকট প্রতিপালিতা হোক আর না’ই হোক। অথচ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দু’জায়গায় এ শর্ত রয়েছে। তবে এ দু’ জায়গায় যেমন এসব শর্ত ছাড়াও এ হুকুম, তদ্রূপ এখানেও যদিও ভয় না থাকে তবুও শুধু সফরের কারণেই সালাতকে ‘কসর’ করা বৈধ।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ‘সালাত হালকা করার নির্দেশ তো ভয়ের অবস্থায়, আর এখন তো নিরাপত্তা রয়েছে (সুতরাং এখন নির্দেশ কি)?’ তখন উমার (রাঃ) উত্তরে বলেন : এ প্রশ্নই আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন :

‘এটা আল্লাহ তা‘আলার একটা সাদাকাহ যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর।’ (আহমাদ ১/২৫, মুসলিম ১/৪৭৮, আবু দাউদ ২/৭, তিরমিযী ৮/৩৯২, নাসাঈ ৬/৩২৭, ইব্ন মাজাহ ১/৩৩৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেছেন, উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়নি, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই অতি পরিচিত। আবু বাকর ইব্ন আবী শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু হানজালা আল হাযা (রহঃ) বলেন, আমি উমারকে (রাঃ) কসর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ‘দু’ রাকআত’। তিনি তখন বলেন, কুরআনে তো ভয়ের অবস্থায় দু’ রাকআতের কথা রয়েছে। আর এখন তো পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করছে?’ উমার (রাঃ) তখন বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এটাই সুনাত’। (ইব্ন আবী শাইবাহ ২/৪৪৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা মাদীনা থেকে মাক্কায় উদ্দেশে রওয়ানা হই। মাদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কসর সালাত আদায় করেছি। কতদিন তারা মাক্কায় অবস্থান করেছিলেন তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা মাক্কায় ১০ দিন অবস্থান করেছিলাম। (ফাতহুল বারী ২/৬৫৩, মুসলিম ১/৪৮১, আবু দাউদ ২/২৫, তিরমিযী ৩/১১০, নাসাঈ ৩/১২১, ইব্ন মাজাহ ১/৩৪২)

মুসনাদ আহমাদে হারিসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ‘মিনার মাঠে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুহর ও আসরের সালাত দু’ রাকআত করে আদায় করেছি, অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক ছিলাম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম।’ (আহমাদ ৪/৩০৬, ফাতহুল বারী ২/৬৫৫, মুসলিম ১/৪৮৪, আবু দাউদ ২/৪৯৩, তিরমিযী ৩/৬২১, নাসাঈ ৩/১১৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, আবু বাকরের (রাঃ) সঙ্গে, উমারের (রাঃ) সঙ্গে এবং উসমানের (রাঃ) সঙ্গে (সফরে) দু’ রাকআত সালাত আদায় করেছি। কিন্তু এখন উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের শেষ যুগে পূর্ণ সালাত আদায় করতে আরম্ভ করেছেন।’

সহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট যখন উসমানের (রাঃ) চার রাকআত সালাত আদায় করার কথা

বর্ণিত হয় তখন তিনি ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করেন এবং বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিনায় দু’রাকআত সালাত আদায় করেছি। (ফাতহুল বারী ২/৬৫৫)

১০২। এবং যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাক, অতঃপর সালাতে দন্ডায়মান হও তখন যেন তাদের একদল তোমার সাথে দন্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সাজদাহ্ সম্পন্ন করে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে সালাত আদায় করে এবং স্ব স্ব আত্মরক্ষিকা ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয়; এবং এতে তোমাদের অপরাধ নেই যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য

১০২. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن

অবমানাকর শাস্তি প্রস্তুত করে
রেখেছেন।

مَطْرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

ভয়ের সালাতের বর্ণনা

ভয়ের সালাত কয়েক প্রকার এবং এর কয়েকটি অবস্থা আছে। কখনও এমন হয় যে, শত্রুরা কিবলার দিকে রয়েছে। কখনও তারা অন্য দিকে থাকে। আবার সালাতও কখনও চার রাকআতের হয়। কখনও তিন রাকআতের হয়, যেমন মাগরিব। কখনও আবার দু'রাকআতের হয়, যেমন ফাজর ও সফরের সালাত। কখনও জামাআতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়, আবার কখনও শত্রুরা এত মুখোমুখী হয়ে থাকে যে, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা সম্ভবই হয়না। বরং পৃথক পৃথকভাবে কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্য দিকে মুখ করে, পায়ে হেঁটে হেঁটে বা সোয়ারীর উপরে, যেভাবেই সম্ভব হয় আদায় করে নেয়া হয়। বরং এমনও হয় এবং ওটা জায়গিও বটে যে, শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকা হয়, তাদেরকে প্রতিরোধও করা হয়, আবার সালাতও আদায় করে যাওয়া হয়। সম্মুখ যুদ্ধের সময় আলেমগণ শুধু এক রাকআত সালাত আদায় করারও ফাতওয়া দিয়েছেন। তাদের দলীল হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) হাদীসটি যাতে বলা হয়েছে : তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা যখন নিজ বাসস্থানে থাকবে তখন চার রাক'আত, যখন সফরে থাকবে তখন দুই রাক'আত এবং ভয়-ভীতির সময় এক রাক'আত সালাত আদায় করবে। (মুসলিম ৬৮৭, আবু দাউদ ১২৪৭, নাসাঈ ৩/১৬৯, ইব্ন মাজাহ ১০৬৮) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'আতা (রহঃ), যাবির (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাকাম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), হাম্মাদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল মারওয়াযী (রহঃ) এবং ইব্ন হাযামেরও (রহঃ) এটাই ফাতওয়া। আবু আসীম আল আবাদী (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল মারওয়াজী (রহঃ) বলেছেন যে, ভয়-ভীতির সময় ফাজরের সালাতও এক রাক'আত হবে। ইব্ন হাজমেরও (রহঃ) একই অভিমত।

ইসহাক ইব্ন রাহউয়াই (রহঃ) বলেন যে, চারিদিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে যাওয়া অবস্থায় এক রাকআতই যথেষ্ট। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে একটা সাজদাহ করবে। কারণ এটাও আল্লাহর যিক্র।

কসর সালাত আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

আবু আইয়াশ (রাঃ) বলেন, ‘আসফান’ নামক স্থানে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রাঃ) সে সময় কুফরীর অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুশরিক সেনাবাহিনীর সেনাপতি। মুশরিকরা আমাদের সামনে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমরা যুহরের সালাত আদায় করি। মুশরিকরা তখন পরস্পর বলাবলি করে : ‘আমরা তো সুযোগ ছেড়ে দিলাম। সময় এমন ছিল যে, তারা সালাতে লিপ্ত ছিল, এ অবস্থায় আমরা তাদেরকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতাম।’ তখন তাদের কয়েক ব্যক্তি বলল, কোন অসুবিধা নেই। এরপরে আর একটা সালাতের সময় আসছে এবং সে সময় সালাত তাদের নিকট তাদের পুত্র ও স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।’ অতঃপর যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে জিবরাঈল (আঃ) **وَإِذَا كُنْتَ**

فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ এ আয়াতটি নিয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে আসরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অস্ত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আমরা তখন অস্ত্র গ্রহণ করে তাঁর পিছনে দু’টি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। অতঃপর তিনি রুকু’ করলে আমরা সবাই রুকু’ করি। তিনি মাথা তুললে আমরাও তাঁর সাথে মাথা তুলি। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর পিছনের প্রথম সারির লোকেরাও সাজদাহ করে এবং অন্য সারির লোকেরা তাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। তারপর যখন এ লোকগুলি সাজদাহ সমাপ্ত করে দাঁড়িয়ে যায় তখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা সাজদায় চলে যায়। যখন এ দু’টি সারির লোকেরই সাজদাহ করা হয়ে যায় তখন প্রথম সারির লোকগুলি দ্বিতীয় সারির লোকদের স্থানে চলে যায়, আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের স্থানে চলে আসে। এরপর কিয়াম, রুকু’ এবং কাওমা সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই আদায় করে। তারপর যখন তিনি সাজদায় যান তখন প্রথম সারির লোকেরা তাঁর সাথে সাজদাহ করে এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে।

যখন প্রথম সারির লোকেরা সাজদাহ সেরে আত্মহিয়্যাতুর জন্য বসে পড়ে তখন দ্বিতীয় সারির লোকগুলি সাজদায় যায় এবং আত্মহিয়্যাতে সবাই এক সঙ্গে হয়ে যায় এবং সালামও সকলেই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক সাথেই ফিরায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘সালাতুল খাওফ’ (ভয়ের সালাত) একবার প্রথমে এই ‘আসফান’ নামক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং দ্বিতীয়বার বানু সালিমের ভূমিতে আদায় করেন।’ (আহমাদ ৪/৫৯-৬০, আবু দাউদ ২/২৮, নাসাঈ ৩/১৭৬-১৭৭) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং এর সমর্থনও অনেক রয়েছে।

সহীহ বুখারীতেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে এবং তাতে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি তাকবীর বললে তারাও তাকবীর বলে। তিনি রুকু’ করলে লোকেরাও তাঁর সাথে রুকু’ করে। অতঃপর তিনি সাজদাহ করলে তারাও তাঁর সাথে সাজদাহ করে। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তাঁর সাথে তারাও দাঁড়িয়ে যান যারা তাঁর সাথে সাজদাহ করেছিল এবং তারপর তারা পিছনে সরে গিয়ে তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে থাকে এবং দ্বিতীয় দল সামনে চলে এসে তাঁর সাথে রুকু’ ও সাজদাহ করে। লোকেরা সবাই সালাতের মধ্যেই ছিল বটে, কিন্তু একে অপরকে পাহারাও দিচ্ছিল।’ (ফাতহুল বারী ২/৫০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাথে নিয়ে ভয়ের সালাত আদায় করেন। এক দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যান এবং আর এক দল তাঁর সামনে অবস্থান করেন। যে দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক‘আত ও দু’টি সাজদাহ করেন। অতঃপর তারা সামনে যে দল অবস্থান করছিল তাদের স্থানে চলে যান এবং সামনের দল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়েও এক রাক‘আত ও দু’টি সাজদাহ করেন এবং যথা নিয়মে সালাম ফিরান। এর ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু’রাক‘আত সালাত আদায় হয়ে যায় এবং সাহাবীগণ এক রাক‘আত সালাত আদায় করেন। (আহমাদ ৩/২৯৮, নাসাঈ ৩/১৭৪, মুসলিম ৮৪০) এ হাদীসটি সহীহহায়িন, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থের লেখকগণ যাবিরের (রাঃ) বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দলকে সাথে নিয়ে এক রাক‘আত সালাত আদায় করেন, তখন দ্বিতীয় দলটি শত্রুদের মোকাবিলা করছিল। অতঃপর প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলটির স্থানে চলে যায় এবং দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলটির স্থানে চলে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক‘আত সালাত আদায় করেন, অতঃপর সালাম ফিরান। এর পর উভয় দল দাঁড়িয়ে আর এক রাক‘আত সালাত আদায় করেন। (একদল সালাত আদায় করার সময় অন্য দল পাহারা দিচ্ছিল)। (দুররুন্ মানসুর ২/৩৭৫)

এ হাদীসটিরও বহু সনদ ও বহু শব্দ রয়েছে। হাফিয আবু বাকর ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) এ সমস্তই সংগ্রহ করেছেন এবং ঐ রকমই ইব্ন জারীরও (রহঃ) জমা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা আমরা ইন্শাআল্লাহ কিতাবুল আহকামিল কাবীরে লিখব।

কারও কারও মতে ভয়ের সালাতে অস্ত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ বাধ্যতামূলক। কেননা আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলি দ্বারা এটাই বুঝা যায়। এ আয়াতেরই পরবর্তী বাক্য এ উক্তির অনুকূলে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ কর তাহলে এতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।’ তারপর বলা হচ্ছে :

وَحْذُوا حِذْرَكُمْ তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর। অর্থাৎ এমন প্রস্তুত থাক যে, সময় এলেই যেন বিনা কষ্ট ও অসুবিধায়ই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হতে পার। আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০৩। অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর তখন দন্ডায়মান , উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের উপর

১০৩. فَإِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত ।

أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

ভয়ের সালাতের পর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (যিক্র) করা উচিত

আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, ‘সালাতুল খাওফ’ বা ভয়ের সময়ের সালাতের পর তোমরা খুব বেশি করে আল্লাহ তা‘আলা যিক্র করবে, যদিও তাঁর যিক্রের নির্দেশ এবং ওর গুরুত্ব অন্য সালাতের পরেও এমন কি সব সময়ের জন্যই রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে এ জন্যই বর্ণনা করেছেন যে, এখানে তিনি বান্দাকে খুব বড় অবকাশ দান করেছেন। তিনি সালাত হালকা করে দিয়েছেন। তাছাড়া সালাতের অবস্থায় এদিক ওদিকে সরে যাওয়া এবং যাতায়াত করা উপযোগীতা অনুযায়ী বৈধ করেছেন। যেমন তিনি মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলি সম্পর্কে বলেন :

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৩৬) যদিও অন্যান্য মাসেও অত্যাচার নিষিদ্ধ, তথাপি এ পবিত্র মাসগুলির মধ্যে ওর থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সব সময়ই আল্লাহ তা‘আলার যিক্র করতে থাক এবং যখন শান্তি এসে যাবে, কোন ভয় ও ত্রাস থাকবেনা তখন নিয়মিতভাবে বিনয়ের সাথে সালাতের রুকনগুলি শারীয়াত মুতাবিক আদায় কর। এ সালাত তোমাদের উপর নির্ধারিত সময়েই ফরযে আইন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা। (তাবারী ৯/১৬৯) মুজাহিদ (রহঃ), সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ), মুহাম্মাদ

ইবন আলী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আতিয়া আল আউফীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ৬/১৬৭-১৬৮)

হাজ্জের সময় যেমন নির্ধারিত রয়েছে, তদ্রূপ সালাতের সময়ও নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম সময়ের পরে দ্বিতীয় সময় এবং দ্বিতীয় সময়ের পরে তৃতীয় সময়।

১০৪। এবং সেই সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করনা; যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তাহলে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট ভোগ করেছে; এবং তৎসহ আল্লাহ হতে তোমাদের যে ভরসা আছে তাদের সেই ভরসা নেই; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

۱۰۴. وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ
الْقَوْمِ ۚ إِنَّ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ
فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا
تَأْلُمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ
مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا

যুদ্ধাহত অবস্থায়ও শত্রুদলকে

পিছু ধাওয়া করতে অনুপ্রেরণা

এরপর বলা হয়েছে যে, তোমরা শত্রুদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে ভীর্ণতা প্রদর্শন করনা। চাতুরীর সাথে গোপনীয় জায়গায় বসে থেকে তাদের খবরাখবর নিতে থাক। তোমরা যদি নিহত বা আহত হও অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাক তাহলে তোমাদের শত্রুরাও তো এরূপ হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকেই নিম্নের শব্দগুলি দ্বারাও বর্ণনা করা হয়েছে :

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়ের তদ্রূপ আঘাত লেগেছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪০) তাহলে বিপদ ও কষ্টে পতিত হওয়ার ব্যাপারে তোমরা ও কাফিরেরা সমান। তবে হ্যাঁ, তোমাদের এবং ওদের

মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা ঐসব আশা করে থাক যেসব আশা তারা করেনা। তোমরা এর সাওয়াব ও প্রতিদানও পাবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হবে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এর অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর অঙ্গীকার টলতে পারেনা। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের তুলনায় তোমাদের মধ্যেই তো বেশি কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যোগ থাকা উচিত। তোমাদের অন্তরেই খুব বেশি জিহাদের উদ্যম থাকা দরকার। পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত, ছড়িয়ে দেয়া এবং সুউচ্চ করার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সদা-সর্বদা শিহরণ ও উত্তেজনা জাগ্রত থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ভাগ্যে লিখে দেন, যা কিছু ফাইসালা করেন, যা কিছু চালু করেন, যে শারীয়াত তিনি নির্ধারণ করেন এবং যে কাজই করেন সব কিছুর ব্যাপারেই তিনি মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। সর্বাবস্থায়ই তিনি মহাপ্রশংসিত।

<p>১০৫। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদেরকে আদেশ প্রদান কর, যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়োনা।</p>	<p>১০৫. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا</p>
<p>১০৬। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।</p>	<p>১০৬. وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا</p>
<p>১০৭। এবং যারা স্বীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে</p>	<p>১০৭. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَحْتَبُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا</p>

ভালবাসেননা।	تُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا
১০৮। তারা মানব হতে গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করতে পারেনা; এবং তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যাতে তিনি সম্মত নন; এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।	<p>১০৮. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنْ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا</p>
১০৯। সাবধান! তোমরাই ঐ লোক যারা ওদের পক্ষ হতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে এবং কে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে?	<p>১০৯. هَاتَيْنِمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا</p>

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী

বিচারের জন্য অন্যকেও নাসীহাত করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ** ‘হে নাবী! আমি তোমার উপর যে কুরআন অবতীর্ণ করেছি তার আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সবই সত্য। ওর খবর সত্য এবং ওর নির্দেশ সত্য।’ তারপরে বলা হচ্ছে, ‘যেন তুমি জনগণের মধ্যে ঐ ন্যায় বিচার করতে পার যা আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন।’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাইনাব বিন্ত উম্মে সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেছেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার কাছে দুই বিবাদকারী তর্ক করছিল। তখন তিনি বাইরে এসে তাদেরকে বললেন :

‘জেনে রেখ যে, আমি একজন মানুষ। যা শুনি সে অনুযায়ী ফাইসালা করে থাকি। খুব সম্ভব যে, এক ব্যক্তি খুব যুক্তিবাদী এবং বাকপটু, আমি তার কথা সঠিক মনে করে হয়তো তার অনুকূলেই মীমাংসা করে দিব, কিন্তু যার অনুকূলে মীমাংসা করব সে হয়তো প্রকৃত হকদার নয়। সে যেন এটা বুঝে নেয় যে, ওটা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি খণ্ড। এখন তার অধিকার রয়েছে যে, হয় সে তা গ্রহণ করবে, না হয় ছেড়ে দিবে।’ (ফাতহুল বারী ৫/১২৮, মুসলিম ৩/১৩৩৭)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন যে, দু’জন আনসারী একটা উত্তরাধিকারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মামলা নিয়ে উপস্থিত হন। তাদের কারও কোন প্রমাণ ছিলনা। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট উপরোক্ত হাদীসটিই বর্ণনা করেন এবং বলেন : ‘কেহ যেন আমার ফাইসালা উপর ভিত্তি করে তার ভাইয়ের সামান্য হকও গ্রহণ না করে। যদি এরূপ করে তাহলে কিয়ামাতের দিন সে স্বীয় স্কন্ধে জাহান্নামের আগুন ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে।’ তখন ঐ দু’জন মনীষী ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বলেন : ‘আমার নিজের হকও আমি আমার ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেন : ‘তোমরা যখন এ কথাই বলছ তখন যাও এবং তোমাদের বিবেচনায় যতদূর সম্ভব হয় ঠিকভাবে অংশ ভাগ কর। তারপর নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় ভাইয়ের অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত হক ক্ষমা করে দাও।’ (আহমাদ ৬/৩২০) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ঐ মুনাফিকদের জ্ঞানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন, :

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ তারা তাদের মন্দ কার্যাবলী জনগণের নিকট গোপন করছে বটে, কিন্তু এতে লাভ কি? তারা সেটা আল্লাহ তা‘আলা হতে গোপন করতে পারবেনা। অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : এভাবে তোমাদের কার্যকলাপ গোপন করে তোমরা পৃথিবীর বিচারকদের নিকট হতে বেঁচে গেলে, কেননা তারা বাহ্যিকের উপর ফাইসালা দিয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তোমরা সেই আল্লাহ তা‘আলার সামনে কি উত্তর দিবে যিনি

প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই জানেন? সেখানে তোমরা তোমাদের মিথ্যা দাবীকে সত্যরূপে প্রমাণ করার জন্য কাকে উকিল করে পাঠাবে? মোট কথা, সে দিন তোমাদের কোন কৌশলই ফলদায়ক হবেনা।’

<p>১১০। এবং যে কেহ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে।</p>	<p>۱۱۰. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا</p>
<p>১১১। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, বস্ত্ততঃ সে স্বীয় আত্মার প্রতিই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।</p>	<p>۱۱۱. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا</p>
<p>১১২। আর যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর ওটা নিরপরাধীর প্রতি আরোপ করে, তাহলে সে নিজেই সেই অপরাধ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।</p>	<p>۱۱۲. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا</p>
<p>১১৩। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত তাহলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, এবং তারা নিজেদেরকে ছাড়া বিপদগামী</p>	<p>۱۱۳. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ</p>

করেনি ও তারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারবেনা; এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রহু ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতেনা তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; এবং তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرونَكَ
مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا
لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় উৎসাহ প্রদান এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী না করা

আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন : وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

কেহ কোন পাপ কাজ করার পর তাওবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে স্বীয় অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার ছোট-বড় পাপ ক্ষমা করে দেন। যদিও সে পাপ আকাশ, যমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয়। (তাবারী ৯/১৯৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন : যখনই আমি কোন কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি তার মাধ্যমে আল্লাহ আমার জন্য যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু লাভবান হয়েছি। আবু বাকর (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি সব সময় সত্য কথাই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে মুসলিম কোন পাপ করার পর উযু করে দু’ রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে থাকেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।’

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে
অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে,
এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? (সূরা আলে ইমরান, ৩
: ১৩৫) (আহমাদ ১/৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ
নিজের উপরই এর প্রতিক্রিয়া পৌছিয়ে থাকে। যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন
করে, অতঃপর নিরপরাধের প্রতি দোষারোপ করে, সে নিজেই সেই অপরাধ ও
প্রকাশ্য পাপ বহন করবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

কেহ কারও বোঝা বহন করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৬৪) অর্থাৎ একে
অপরের কোন উপকার করতে পারবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের ফল
ভোগ করতে হবে। তার কর্মের ফল অন্য কেহ ভোগ করবেনা। এ জন্য আল্লাহ
তা'আলা বলেন :

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
তিনি মহাজ্ঞানী; বিজ্ঞানময়। তাঁর জ্ঞান, তাঁর
নিপুণতা, তাঁর ন্যায়নীতি এবং তাঁর করুণা এর উল্টা যে, একের পাপের কারণে
তিনি অপরকে শাস্তি দিবেন।

এখানে 'কিতাব' শব্দ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং حَكْمَت শব্দ
দ্বারা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা জানতেননা, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে তা
জানিয়ে দেন। তাই তিনি বলেন :

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
তিনি তোমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন যা তুমি
জানতেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাশা করেছি রুহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতেনা কিভাবে কি? (সূরা শূরা, ৪২ : ৫২) হতে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো শুধু তোমার রবের অনুগ্রহ। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৬) এ জন্য এখানেও বলেন :

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।

১১৪। সাধারণ লোকের
অধিকাংশ গোপন পরামর্শে
কোন মঙ্গল নিহিত থাকেনা,
তবে হ্যাঁ যে ব্যক্তি দান
খাইরাত করে অথবা কোন সৎ
কাজ করে কিংবা লোকের
মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন
করে দেয়ার উদ্দেশে তা করে
তাহলে তা স্বতন্ত্র এবং যে
আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের
জন্য ঐরূপ করে, আমি তাকে
মহান বিনিময় প্রদান করব।

١١٤. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ
نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

১১৫। আর সুপথ প্রকাশিত
হওয়ার পর যে রাসুলের
বিরুদ্ধাচরণ করে এবং
বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের
অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে
অভিনিবিষ্ট আমি তাকে
তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব

١١٥. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا

এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ
করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর
প্রত্যাবর্তন স্থল।

تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا

মীমাংসা করণ ও গোপন কথন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوَاهُمْ** জনগণের অধিকাংশ গোপন কথাই অমঙ্গলজনক হয়। তবে কতক লোক এমনও আছে যে, তারা মানুষকে দান খাইরাত করার, সৎকাজ সাধনের এবং পরস্পর মিলেমিশে থাকার উৎসাহ দিয়ে থাকে।

মুসনাদ আহমাদে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন :

‘জনগণের মধ্যে মিলমিশ এবং সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে বা এদিক হতে ওদিকে এ প্রকারের আলাপ আলোচনা করে সে মিথ্যাবাদী নয়।’ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) আরও বলেন, ‘তিন জায়গায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। (১) যুদ্ধে, (২) জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে এবং (৩) স্বামীর এক ধরনের কথা স্ত্রীকে বলা এবং স্ত্রীর এক ধরনের কথা স্বামীকে বলা।’ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহও (রাঃ) ঐ হিজরাতকারী দলে ছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন। (আহমাদ ৬/৪০৩, ফাতহুল বারী ৫/৩৫৩, মুসলিম ৫/২০১১, আবু দাউদ ৫/২১৮, তিরমিযী ৬/৭০, নাসাঈ ৫/১৯৩)

আবু দারদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলে দিবনা যা সালাত এবং সিয়াম অপেক্ষাও উত্তম?’ সাহাবীগণ বলেন, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি বলুন।’ তখন তিনি বলেন : ‘জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা এবং তাদের পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া।’ (আহমাদ ৬/৪৪৪, আবু দাউদ ৪৯১৯, তিরমিযী ২৫০৯)

মুসনাদ বায্বারে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আইউবকে (রাঃ) বলেন : ‘এসো, আমি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দিই।

লোকেরা যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন তুমি তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও, যখন একজন অপরজন হতে সরে থাকে তখন তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দাও।’

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব।

রাসূলের (সাঃ) পথনির্দেশকে অমান্য করা এবং তাঁর বিপরীত শিক্ষাকে গ্রহণ করার শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
যে ব্যক্তি শারীয়াতের বিপরীত পথে চলে; রাসূল যে দিকে চলার নির্দেশ দেন সে তার বিপরীত দিকে চলে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সে দলীল প্রমাণাদি দেখেছে; আমিও তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দিব। ঐ খারাপ পথই তখন তার নিকট ভাল বলে মনে হবে, অতঃপর সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।

মুসলিমদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। তা কখনও হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট কথাই উল্টা হতে পারে, আবার কখনও কখনও ঐ জিনিসের বিপরীত হতে পারে যার উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সবাই একমত রয়েছে। তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ভুল হতে রক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন :

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
যে পথ সে পছন্দ করেছে
তাকে তাতেই পরিচালিত করব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, কত নিকৃষ্ট ঐ গন্তব্য স্থল! যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন :

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা।
(সূরা কলম, ৬৮ : ৪৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফফ, ৬১ : ৫) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১০) যেমন এক জায়গায় রয়েছে :

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ

একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَرَاءَ الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَافِقُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৫৩)

১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন; এবং যে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে সে নিশ্চয়ই সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।

১১৬. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

১১৭। তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা।

১১৭. إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْسَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا

<p>১১৮। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শাইতান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব</p>	<p>۱۱۸. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا</p>
<p>১১৯। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।</p>	<p>۱۱۹. وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَثَّهُمْ فَلْيَغْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا</p>
<p>১২০। শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা।</p>	<p>۱۲۰. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا</p>
<p>১২১। তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং সেখান হতে তারা পালানোর কোন জায়গা পাবেনা।</p>	<p>۱۲۱. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَخِيصًا</p>

১২২। এবং যারা বিশ্বাস
স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ
করে, আমি তাদেরকে
জান্নাতে প্রবেষ্ট করাব যার
নিম্নে স্রোতস্থিনীসমূহ
প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা
চিরকাল অবস্থান করবে,
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য;
এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা
বাক্যে অধিকতর
সত্যপরায়ণ?

۱۲۲. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

শিরুককারীকে কখনো ক্ষমা করা হবেনা মুশরিকরা প্রকৃতপক্ষে শাইতানেরই ইবাদাত করে

এ সূরার প্রথম দিকে আমরা **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** এ
আয়াতটির তাফসীর করেছি এবং সেখানে এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত
হাদীসগুলিও বর্ণনা করেছি।

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা মালাইকা/ফেরেশতাদের পূজা করত
এবং তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার মেয়ে বলে বিশ্বাস করত ও বলত : ‘তাদের
ইবাদাত দ্বারা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ।’
তারা নারীদের আকারে মালাইকার ছবি প্রতিষ্ঠিত করত। অতঃপর অন্ধভাবে
তাদের ইবাদাত করত এবং বলত যে, এগুলো হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতাদের
ছবি, তারা আল্লাহর কন্যা। এ তাফসীর **الْأَفْرَائِمُ اللَّاتُ وَالْعُزَّى** (৫৩ : ১৯) এ
আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ মিলে যায়। সেখানে তাদের মূর্তিগুলোর নাম
নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তাদের এ কেমন সুবিচার যে, ছেলেগুলি
হচ্ছে তাদের এবং মেয়েগুলি আমার!’ অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِئًا

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৯) আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا

আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا শাইতান তাদেরকে উহা করতে বলে এবং এ জন্য উহা তাদের জন্য সুশোভন করে তোলে। এর ফলে তারা শাইতানের ইবাদাত করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তারা শাইতানেরই পূজারী। কেননা সে'ই তাকে এ পথে চালিত করেছে এবং আসলে তাকেই সে মানছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৬০) এ কারণেই কিয়ামাতের দিন মালাইকা স্পষ্টভাবে বলে দিবেন :

سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنُونَ

আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারা তো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৪১) শাইতানকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক বান্দাকে সে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জনকে সে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকবে যে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সে বলেছিল :

لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا আমি মানুষকে সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট করব, তাকে আমি এমন আশা দিতে থাকব যে, সে তাওবাহ করা ছেড়ে দিবে, স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং মরণকে ভুলে যাবে। ফলে সে আখিরাত হতে বহু দূরে সরে পড়বে। তাদের দ্বারা আমি পশুর কান কাটিয়ে ছিদ্র করিয়ে

দিব এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকব। আল্লাহর তৈরী করা আকৃতি নষ্ট করার কাজে তাদের উৎসাহিত করব। যেমন অশুভকোষ কর্তিত করা। একটি হাদীসে এটার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চেহারার উপর উঙ্কী করা এবং উঙ্কী করিয়ে নেয়া এও একটি অর্থ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে এবং যে এরূপ উঙ্কী করিয়ে নেয় তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। (মুসলিম ৩/১৬১৮, ফাতহুল বারী ১০/৩৯২)

সহীহ সনদে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যারা উঙ্কী করে ও করিয়ে নেয়, কপালের চুল তুলে ও তুলিয়ে নেয় এবং দাঁতে বিস্তৃতি সাধন করে, তাদের উপর অভিসম্পাত রয়েছে। আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করবনা কেন যাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং যা আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে?’ অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর, ৫৯ : ৭) (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির উপরই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াহুদী করে, খৃষ্টান করে বা মাজুসী করে। যেমন ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষেরাই তার কান কেটে তাকে দোষযুক্ত করে থাকে।’

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইবনে হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে এক মুখী দীনের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান এসে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর আমি আমার বৈধকে তাদের উপর অবৈধ করেছি।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি

সাধন করে, যে ক্ষতির আর পূরণ নেই। কেননা **يَعِدُّهُمْ يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا** শাইতান তাকে ধোঁকা দিতে রয়েছে, শাইতান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার মুক্তি ও মঙ্গল ঐ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামাতের দিন শাইতান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে : আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২২) **أُولَئِكَ** শাইতানের অঙ্গীকারকে সঠিক জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহান্নামেই পৌঁছে যাবে, যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব।

সং আমলকারীদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন সং লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন : **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** যে আমাকে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং শরীরের দ্বারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে, আমার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে, আমি যা নিষেধ করেছি সেটা হতে বিরত থাকে, তাকে আমি আমার নি'আমাত দান করব এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব। ঐ জান্নাতের নদীগুলি তাদের ইচ্ছা মত বইতে থাকবে, সেখানে না আছে ধ্বংস, না আছে মৃত্যু এবং না আছে কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। আল্লাহ তা'আলার এ অঙ্গীকার অটল ও সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং তিনি ছাড়া কেহ পালনকর্তাও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলতেন :

‘সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের বাণী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। আর সমস্ত কাজের মধ্যে জঘন্যতম কাজ হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ এবং প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহই হচ্ছে বিদ‘আত, আর সকল বিদ‘আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।’ (মুসলিম, ইব্ন মাজাহ)

১২৩। না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কেহকে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবেনা।

۱۲۳. لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۖ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খেজুর দানার কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা।

۱۲۴. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

১২৫। আর যে আল্লাহর উদ্দেশে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে ও সৎ কাজ করে এবং ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা

۱۲۵. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

<p>কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছিলেন।</p>	<p>وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا</p>
<p>১২৬। এবং নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহরই জন্য; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিবেষ্টনকারী।</p>	<p>۱۲۶. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا</p>

সাফল্য লাভ হয় উত্তম আমলের মাধ্যমে, আমল করার শুধু ইচ্ছা করলেই হবেনা

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ‘আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে তর্ক হয়। আহলে কিতাব এই বলে মুসলিমদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিল যে, তাদের নাবী (আঃ) মুসলিমদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং তাদের কিতাবও মুসলিমদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিমদের প্রতিপক্ষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ৯/২২৯) সুদ্দী (রহঃ), মাসরুফ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবু সালিহও (রহঃ) এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ৯/২২৯-২৩১) আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটির ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে তাদের ধর্ম বিষয়ে বিতর্ক হয়। তাওরাতের অনুসারীরা বলে : আমাদের ধর্মগ্রন্থই উত্তম গ্রন্থ এবং আমাদের নাবী হলেন শ্রেষ্ঠ নাবী। ইঞ্জিল গ্রন্থের অনুসারীরাও অনুরূপ কথা বলে। তখন মুসলিমরা বলেন, ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই, আমাদের ধর্মগ্রন্থ নাযিল হওয়ার পর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বাতিল হয়ে গেছে, আমাদের নাবী হলেন সর্বশেষ নাবী এবং তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের গ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের উপর আমল করবে। আল্লাহ তা‘আলা তখন তাদের তর্কের ফাইসালা এভাবে করে দেন :

نَا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। (৪ : ১২৩) (তাবারী ৯/২৩০)

আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, শুধু মুখের কথা ও দাবীর দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়না। বরং ঈমানদার হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার অন্তর পরিষ্কার হয়, আমল তার সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল তার হাতে থাকে। হে মুশরিকের দল! তোমাদের মনের বাসনা ও অসার দাবীর কোন মূল্য নেই এবং আহলে কিতাবের উচ্চাকাংখা এবং বড় বড় বুলিও মুক্তির মাপকাঠি নয়। বরং মুক্তির মাপকাঠি হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও রাসূলগণের আনুগত্য স্বীকার। মন্দ আমলকারীদের সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে, যার কারণে তাদেরকে তাদের মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবেনা? বরং কিয়ামাতের দিন ভাল-মন্দ যে যা করেছে তিল পরিমাণ হলেও তার চোখের সামনে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৭-৮)

এ আয়াতটি সাহাবীগণের সামনে খুবই কঠিন ঠেকেছিল। আবু বাকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অণু পরিমাণ কাজেরও যখন প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তি কিরূপে পাওয়া যাবে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'প্রত্যেক মন্দ কার্যকারী দুনিয়ায়ই প্রতিদান পাবে।' একটি হাদীসে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আয়াতটি আমাদের উপর খুব ভারী বোধ হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

'মু'মিনের এ প্রতিদান ওটাই যা দুনিয়ায়ই তার উপর বিপদ-আপদের আকারে আপতিত হয়।' (তাবারী ৯/২৪৬, আবু দাউদ ৩/৪৭১)

সাদ্দ ইবনে মানসুর (রহঃ) বলেন যে, যখন উপরোক্ত আয়াতটি সাহাবীগণের উপর ভারী বোধ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন : 'তোমরা সঠিকভাবে এবং মিলেমিশে থাক, মুসলিমের প্রত্যেক বিপদই হচ্ছে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এমনকি কাঁটা ফুটলেও (ঐ কারণে পাপ ক্ষমা হয়ে থাকে)।' এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুফিয়ান ইবন

উয়াইনা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ২/২৪৮, মুসলিম ৪/১৯৯৩, তিরমিযী ৮/৪০০, নাসাঈ ৬/৩২৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্নে যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের ভাবার্থ হচ্ছে শির্ক।

এরপর বলা হচ্ছে : **وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** এ ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি সে তাওবাহ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাবারী ৯/২৩৯)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ মন্দ কাজের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ কাজের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মন্দ কাজের শাস্তি হয়তো দুনিয়ায়ই দেয়া হয় এবং এটাই বান্দার জন্য উত্তম, অথবা পরকালে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে উভয় জগতে নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমাদেরকে যেন তিনি ধরপাকড় ও অসম্ভব হতে রক্ষা করেন। সৎ কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা তা গ্রহণ করে থাকেন। কোন নর-নারীর সৎ কাজ তিনি নষ্ট করেননা। তবে শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মুসলিম। এ সৎ লোকদেরকে তিনি স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের সাওয়াব তিনি মোটেই কম হতে দিবেননা। **نَفِيرٌ** বলা হয় খেজুরের আঁটির উপরিভাগের পাতলা আঁশকে। **فَتِيلٌ** বলা হয় খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলের হালকা ছালকে। এ দু'টি থাকে খেজুরের আঁটির মধ্যে। আর **فِطْمِيرٌ** বলা হয় ঐ আঁটির উপরের আবরণকে। কুরআনুল হাকীমে এরূপ স্থলে এ তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ওর চেয়ে উত্তম ধর্মের লোক আর কে হতে পারে যে স্বীয় আনন আল্লাহর উদ্দেশে সমর্পণ করেছে? ঈমানদারী ও সৎ নিয়তে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সে সৎকর্মশীলও হয়। অর্থাৎ সে শারীয়াতের অনুসারী, সত্যধর্ম ও সুপথের পথিক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উপর আমলকারী।

প্রত্যেক ভাল কাজ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য এ দু'টি শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ আন্তরিকতা ও অহী অনুযায়ী হওয়া। **خُلُوصٌ** বা আন্তরিকতার ভাবার্থ এই যে, উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। আর সঠিক হওয়ার অর্থ এই যে, সেটা হবে শারীয়াত অনুযায়ী। সুতরাং বাহির তো কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হওয়ার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায়। আর ভিতর সুসজ্জিত হয় সৎ নিয়াজের দ্বারা। যদি এ দু'টির মধ্যে একটি না থাকে তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আন্তরিকতা না থাকলে কপটতা চলে আসে। তখন মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদেরকে দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই সেই অবস্থায় আমল গ্রহণযোগ্য হয়না।

সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ না হলে পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা একত্রিত হয়ে যায়, ফলে তখনও আমল গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়না। যেহেতু মু'মিনের আমল লোক দেখানো হতে এবং শারীয়াতের বিপরীত হওয়া থেকে মুক্ত, সেহেতু তার কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। ঐ কাজই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা ভালবাসেন এবং সে জন্যই তা পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেন—‘তারা ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে থাকে।’ অর্থাৎ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক তাঁর পদাংক অনুসরণ করবেন তাদের সকলের ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ

নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৮) আর এক আয়াতে রয়েছে :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(হে নাবী) এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাশা করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২৩)

حَنِيفٌ বলা হয় স্বেচ্ছায় শিরুক হতে অসন্তোষ প্রকাশকারীকে ও পূর্ণভাবে সত্যের দিকে মন সংযোগকারীকে, যাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিতে পারেনা এবং কোন দূরকারী দূর করতে পারেনা।

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) আনুগত্য স্বীকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এবং তৎপ্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, **وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا** তিনি আল্লাহর বন্ধু। অর্থাৎ বান্দা উন্নতি করতে করতে যে উচ্চতম পদ বা সোপান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, ইবরাহীম (আঃ) সেই সোপান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। বন্ধুত্বের দরজা অপেক্ষা বড় দরজা আর নেই। এটা হচ্ছে ভালাবাসার উচ্চতম স্থান। ইবরাহীম (আঃ) ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এর কারণ ছিল তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

এবং ইবরাহীম পূরাপুরি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩৭) অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশাবলী সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করেছিলেন। কখনও তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি। তাঁর ইবাদাতে তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কোন কিছু তাঁকে তাঁর ইবাদাত হতে বিরত রাখতে পারেনি। আর একটি আয়াতে আছে :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৪) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উন্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২০)

সহীহ বুখারীতে আমার ইবনে মাইমুন (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মু‘আয (রাঃ) যখন ইয়ামানে ফাজরের সালাতে **خَلِيلًا** **إِبْرَاهِيمَ** **اللَّهُ** **وَاتَّخَذَ** এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন একটি লোক বলেন : **لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ** ইবরাহীমের (আঃ) মায়ের চক্ষু ঠাণ্ডা হল।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৬২) তাঁকে আল্লাহর বন্ধু বলার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা

ছিল। আর ছিল তাঁর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। তিনি স্বীয় ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন :

‘হে জনমণ্ডলী! দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি যদি কেহকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী হতাম তাহলে আবু বাকর ইবন আবু কুহাফাকে (রাঃ) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (আমি) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।’ (ফাতহুল বারী ৭/১৫, মুসলিম ৪/১৮৫৪)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা'আলা যেমন ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তদ্রূপ তিনি আমাকেও তাঁর বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।’ (মুসলিম ১/৩৭৭, ৪/১৮৫৫; ইবন মাজাহ ১/৫০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধিকারে রয়েছে এবং সবাই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ আছে। সবই তাঁর সৃষ্ট। তিনি যখন যা করার ইচ্ছা করেন, বিনা বাধা-বিপত্তিতে তাই করে থাকেন। কারও সাথে পরামর্শ করার তাঁর প্রয়োজন হয়না। এমন কেহ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা হতে ফিরিয়ে দিতে পারে। কেহ তাঁর আদেশের সামনে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াতে পারেনা। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায় বিচারক, মহা বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী ও পরম দয়ালু। তিনি এক। কারও মুখাপেক্ষী তিনি নন। কোন লুকায়িত জিনিস, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস এবং বহু দূরের জিনিস তাঁর নিকট গুপ্ত নেই। যা কিছু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তার সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান।

১২৭। এবং তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন এবং পিতৃহীনা নারীদের

۱۲۷. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي

সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রহণ
হতে পাঠ করা হয়েছে যে,
তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ
হয়েছে তা তোমরা প্রদান
করছনা, অথচ তাদেরকে বিয়ে
করতে বাসনা কর এবং
শিশুদের মধ্যে দুর্বলদের ও
পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার
প্রতিষ্ঠা কর এবং তোমরা যে
সং কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ
তদ্বিষয়ে খুব ভাল জানেন

يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

পিতৃহীনা ইয়াতীমের ব্যাপারে নির্দেশ

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, এ আয়াতে
ঐ লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে কোন পিতৃহীনা বালিকাকে লালন-
পালন করে যার অভিভাবক/উত্তরাধিকারী সে নিজেই এবং সে তার সম্পদে
অংশীদার হয়ে গেছে। এখন সে ঐ মেয়েটিকে নিজে বিয়ে করার ইচ্ছা করে বলে
তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা প্রদান করে। এরূপ লোকের সম্বন্ধেই এ
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১১৪, মুসলিম ৪/১৪২৩)

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন জনগণ
পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ পিতৃহীন মেয়েদের
সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ তা‘আলা ... وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... এ
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي
وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْكِتَابِ

... الْيَتَامَى (নিসা, ৪ : ৩) আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে।’ আয়িশা (রাঃ) হতে
এটাও বর্ণিত আছে যে, পিতৃহীনা মেয়েদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীগণ যখন
ঐ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেত এবং তারা সুন্দরী না হত তখন তারা

তাদেরকে বিয়ে করা হতে বিরত থাকত। আর তাদের ধন-সম্পদ বেশি থাকলে এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করত। কিন্তু তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকত না বলে ঐ অবস্থায়ও তাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য কম দিত। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, পিতৃহীনা বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য পুরাপুরি দেয়া ছাড়া বিয়ে করার অনুমতি নেই। (ফাতহুল বারী ৯/৬, মুসলিম ৪/২৩১৩) উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ পিতৃহীনা বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্য বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, ঐ মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই মোহর তাকেও দিতে হবে। যদি তা না দেয়া হয় তাহলে তার উচিত, সে যেন তাকে বিয়ে না করে।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : অজ্ঞতার যুগে এ প্রথা ছিল যে, পিতৃহীনা বালিকার অভিভাবক যখন মেয়েটিকে তার অভিভাবকত্বে নিয়ে নিত তখন সে তার উপরে একটা কাপড় ফেলে দিত। তখন তাকে বিয়ে করার আর কারও কোন ক্ষমতা থাকতনা। এখন যদি সে সুশ্রী হত তাহলে সে তাকে বিয়ে করে নিত এবং তার সম্পদও গলাধঃকরণ করত। আর যদি সে দেখতে সুন্দর না হত, কিন্তু তার বহু সম্পদ থাকত তাহলে সে তাকে নিজেও বিয়ে করতনা এবং অন্য জায়গায় বিয়ে করতেও তাকে বাধা দিত। ফলে মেয়েটি ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করত এবং ঐ লোকটি তার সম্পদ হস্তগত করত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কাজে চরমভাবে বাধা প্রদান করছেন। (তাবারী ৯/২৬৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এর সাথে সাথে এটাও বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতা যুগের লোকেরা ছোট ছেলেদেরকে এবং সব মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করত। কুরআন কারীমে এ কু-প্রথার মূলেও কুঠারাম্বাত করা হয়েছে। প্রত্যেককেই অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ছেলে এবং মেয়ে ছোটই হোক বা বড়ই হোক তাদেরকে অংশ প্রদান কর, তবে মেয়েকে অর্ধেক ও ছেলেকে পূর্ণ দাও'। অর্থাৎ একটি ছেলেকে দু'টি মেয়ের সমান অংশ প্রদান কর। আর পিতৃহীনা মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা সৌন্দর্য ও সম্পদের অধিকারিণী পিতৃহীনা মেয়েদেরকে নিজেই বিয়ে করবে তখন যাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম আছে তাদেরকেও বিয়ে কর।' তারপর বলা হচ্ছে :

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا তোমাদের সমুদয় কাজ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন। সুতরাং তোমাদের উচিত ভাল কাজ করা এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে ভাল প্রতিদান গ্রহণ করা।

১২৮। কোন নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে তারা উভয়ে আপোষ মীমাংসা করে নিলে তাতে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই। বস্তুতঃ আপোষ মীমাংসাই উত্তম। এবং লোভের কারণে স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয় কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎ ব্যবহার কর ও সংযমী হও তাহলে তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।

۱۲۸. وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

১২৯। তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ঝুকে পড়না ও অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখনা এবং যদি তোমরা পরস্পর সমঝতায় এসো ও সংযমী হও

۱۲۹. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
১৩০। এবং যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য হতে তাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করবেন এবং আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্জানী।	১৩০. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

স্ত্রী হতে যে স্বামী পৃথক হতে চায় তার ব্যাপারে নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা স্ত্রীর অবস্থাসমূহ এবং তাদের নির্দেশাবলীর নির্দেশ দিচ্ছেন। স্বামীরা কখনও কখনও তাদের প্রতি অসম্মত হয়ে থাকে। তারা কখনও স্ত্রীদেরকে চায়, আবার কখনও পৃথক করে দেয়। সুতরাং যখন স্ত্রী তার স্বামীর অসম্মতির মনোভাব বুঝতে পারবে তখন যদি সে তাকে সম্মত করার উদ্দেশে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা সে করতে পারে। যেমন সে তার খাদ্য ও বস্ত্র ছেড়ে দেয় বা রাত্রি যাপনের হক ছেড়ে দেয়, তাহলে উভয়ের জন্য এটা বৈধ। অতঃপর ওরই প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিই উত্তম।

আবু দাউদ তায়ালেসী (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : সাওদাহ বিন্ত যামআহ (রাঃ) যখন খুবই বৃদ্ধা হয়ে যান এবং বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছা রাখেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : ‘আমি আমার পালার হক আয়িশাকে (রাঃ) দিয়ে দিলাম।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা স্বীকার করে নেন এবং এর উপরেই সন্ধি হয়ে যায়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে যে, সাওদাহর (রাঃ) (রাত্রি যাপনের) পালার দিনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশাকে (রাঃ) প্রদান করতেন। (ফাতহুল বারী ৯/২২৩, মুসলিম ২/১০৮৫)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে : এর ভাবার্থ এই যে, কোন বৃদ্ধা স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালবাসেনা বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন সে

যেন তাকে বলে : ‘আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে পৃথক করনা।’ (বুখারী ৪৬০১)

শান্তি/সন্ধি কল্যাণকর পন্থা

الصُّلْحُ خَيْرٌ অর্থাৎ সন্ধি কল্যাণকর। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে দু’টি বিষয়ের কোন একটি বিষয় গ্রহণ করার অধিকার দেয় যে, সে ইচ্ছা করলে ঐভাবেই থাকবে যে, সে অন্য স্ত্রীর সমান অধিকার লাভ করবেনা অথবা তালাক গ্রহণ করবে। এটা ওর চেয়ে উত্তম যে, সে তার স্ত্রীকে কিছু না বলেই অন্য স্ত্রীকে তার উপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দিবে এবং ফলে স্বামী তাকে তালাক দিবেনা, বরং পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। এটা তালাক দেয়া ও নেয়া অপেক্ষা উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওদা বিনতে জামাআ’কে (রাঃ) স্বীয় স্ত্রী রূপেই রেখে দেন এবং তিনি তাঁর হক আয়িশাকে (রাঃ) দান করে দেন। তার এ কাজের মধ্যে তাঁর উম্মাতের জন্য সুন্দর নমুনা রয়েছে যে, মনোমালিন্যের অবস্থায়ও তালাকের প্রশ্ন উঠবেনা। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলার নিকট বিচ্ছেদ হতে সন্ধি উত্তম সেহেতু বলেছেন যে, সন্ধিই কল্যাণকর। এমন কি ইব্ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ তোমাদের অনুগ্রহ ও তাকওয়া প্রদর্শন করা অর্থাৎ স্ত্রীর অন্যায়কে ক্ষমা এবং তাকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার পূর্ণ প্রাপ্য দিয়ে দেয়া এবং পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা খুবই উত্তম কাজ, যা আল্লাহ তা‘আলা খুব ভালই জানেন। আর এর বিনিময়ে দিবেন তিনি উত্তম প্রতিদান। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ তোমরা যদিও কামনা কর যে, তোমাদের কয়েকটি স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রকারের ন্যায় ও সমতা বজায় রাখবে, তবুও তোমরা তা পারবেনা। কেননা তোমরা হয়তো একটি একটি করে রাতের পালা করে দিতে পার, কিন্তু প্রেম, চাহিদা, সঙ্গম ইত্যাদির সমতা কি রূপে রক্ষা করবে?

ইব্ন মুলাইকা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এ জন্যই হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্যে সঠিকভাবে সমতা রক্ষা করে চলতেন। তথাপি তিনি আল্লাহ তা‘আলার কাছে একনিষ্ঠ প্রার্থনা করতেন :

‘হে আমার রাব্ব! এটা ঐ বন্টন যা আমার অধিকারে রয়েছে। এখন যেটা আমার অধিকারের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক, সেই ব্যাপারে আপনি অভিযুক্ত করবেননা।’ (আবু দাউদ ২১৩৪, তিরমিযী ১১৪০, ইব্ন মাজাহ ১৯৭১, নাসাঈ ৭/৬৩) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, অন্য সনদে এটা মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে এবং ওটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ একদিকে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে পড়না যার ফলে অপর স্ত্রী দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কেননা সে সময় তার স্বামী থেকেও না থাকা হবে। তুমি তার থেকে সরে থাকবে অথচ সে তোমার পত্নীত্বের বন্ধনেই আবদ্ধ থাকবে। না তুমি তাকে তালাক দিবে যে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে, আর না তুমি তার সে হক আদায় করবে যে হক প্রত্যেক স্ত্রীর তার স্বামীর উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যার দুই স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু একজনের দিকেই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে, সে কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের অর্ধেক অংশের গোশত খসে পড়বে।’ (আবু দাউদ ৩২২) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا তোমরা যদি তোমাদের কাজের সংশোধন করে নাও এবং যতদূর তোমাদের সাধের মধ্যে রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও সমতা রক্ষা কর ও সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চল তাহলে যদি কোন সময় কারও দিকে কিছু আসক্ত হয়েই পড়, সেটা তিনি ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা করছেন :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا যদি স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েই যায় তাহলে আল্লাহ তা‘আলা একজনকে অপরজন হতে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। স্বামীকে তিনি এ স্ত্রী অপেক্ষা ভাল স্ত্রী দান করবেন এবং স্ত্রীকেও তিনি এ স্বামী অপেক্ষা ভাল স্বামী দান করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ

বড়ই প্রশস্ত, তিনি খুবই অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানময়ও বটে। তাঁর সমস্ত কাজ এবং সমস্ত শারীয়াত পূর্ণ জ্ঞান ও নৈপুণ্যে ভরপুর।

১৩১। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই জন্ম; এবং নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রহ প্রদত্ত হয়েছিল, আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে আদেশ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী, প্রশংসিত।

১৩১. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

১৩২। এবং আকাশসমূহে যা কিছু রয়েছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; এবং কর্মবিধানে (ওয়াকিল) আল্লাহই যথেষ্ট।

১৩২. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

১৩৩। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোক সকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান।

১৩৩. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

১৩৪। যে ইহলোকের প্রতিদান আকাংখা করে, আল্লাহর নিকট ইহলোক ও পরলোকের প্রতিদান রয়েছে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।

۱۳۴. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

আল্লাহতীতির প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি বলেন, যে নির্দেশাবলী তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাস করবে, তাঁর ইবাদাত করবে এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা, এ নির্দেশাবলীই তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবকেও দেয়া হয়েছিল। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তাঁর কি ক্ষতি করতে পারবে? তিনি তো একাই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যেমন মূসা (আঃ) স্বীয় গোত্রের লোককে বলেছিলেন :

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৮) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ۖ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৬)

বলা হচ্ছে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের মালিক ও তিনি প্রত্যেকের সমস্ত কাজের উপর সাক্ষী। কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। তিনি এ ক্ষমতাও রাখেন যে, তোমরা যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য মাখলুক আনয়ন করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ.

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮)

এ আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ কাজ মোটেই কঠিন নয়! অতঃপর তিনি বলেন, হে ঐ ব্যক্তি! যার মনোবাসনা ও চেষ্টা একমাত্র দুনিয়ার জন্য সে যেন জেনে নেয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার অধিকারেই রয়েছে। সুতরাং যখন তুমি তাঁর নিকট দু'টিই যাপণ করবে তখন তিনি তোমাকে দু'টিই দান করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন এবং পরিতৃপ্ত করবেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

কিন্তু মানবমন্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আছে যারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই অংশ রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২০০-২০২) আর এক আয়াতে আছে :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই। (সূরা শূরা, ৪২ : ২০) অন্য স্থানে রয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৮) অন্যত্র তিনি বলেন :

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২১)

বলা হচ্ছে, যে তোমাদেরকে দুনিয়ায় দিচ্ছেন, আখিরাতের অধিকারীও তিনিই। এটা বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় যে, তোমরা তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে নিবে এবং অধিক প্রদানকারীর নিকট অল্প যাঞ্চণ করবে। না, না বরং তোমরা ইহকাল ও পরকালের বড় বড় কাজ ও উত্তম উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা কর। স্বীয় লক্ষ্যস্থল শুধু দুনিয়াকে বানিয়ে নিওনা, বরং উচ্চাকাংখার দ্বারা দৃষ্টি প্রসারিত করে উভয় জগতে শান্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের তো এটা চিন্তা করা উচিত যে, যিনি তোমাদেরকে দেখা-শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, তাঁর নিজের দর্শন ও শ্রবণ কেমন হতে পারে।

১৩৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদিও সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা, আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের পূর্ণ সংবাদ রাখেন।

۱۳۵. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ اِلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا۟ ۚ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلَوْۤا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষী প্রদান করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তা থেকে যেন এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক সরে না পড়ে। এরূপ যেন না হয় যে তারা কারও ভয়ে, কোন লোভে, কারও তোষামোদে, কারও প্রতি দয়া দেখিয়ে এবং কারও সুপারিশে ইনসারফকে ছেড়ে দেয়। তারা সম্মিলিতভাবে যেন ইনসারফ প্রতিষ্ঠিত করে। এ ব্যাপারে যেন তারা একে অপরের সহযোগিতা করে আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় বিচার কায়ম করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে। (সূরা তালাক, ৬৫ : ২) সাক্ষ্য আল্লাহ তা‘আলার সম্ভূতির উদ্দেশে হলেই তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক, ন্যায় ভিত্তিক ও সত্য। তাতে থাকবেনা কোন পরিবর্তন ও গোপন করার প্রবণতা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমরা স্পষ্ট ও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও তা তোমাদের নিজেদের প্রতিকূল হয়। তোমরা সত্য কথা বলা হতে বিরত হয়েনা এবং বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় অনুগত দাসদের মুক্তির বহু উপায় বের করে থাকেন। তোমাদের মুক্তি যে মিথ্যা সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে এমন কোন কথা নয়। তারপর বলা হচ্ছে :

وَالْأَقْرَبِينَ যদিও সত্য সাক্ষ্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তথাপি তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। কেননা সত্য প্রত্যেকের উপর বিচারক। সাক্ষ্য প্রদানের সময় ধনীর প্রতি লক্ষ্য রেখনা কিংবা গরীবের উপরও দয়া প্রদর্শন করনা। তাদের মঙ্গলের বিবেচনা তোমাদের অপেক্ষা তাঁরই বেশি রয়েছে। তোমরা সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্যই প্রদান কর। কারও ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করনা, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি শত্রুতা করে ন্যায় ও সাম্য হাত ছাড়া করনা। সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর অটল থাক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে (রাঃ) যখন খাইবারবাসীদের ক্ষেত ও শস্য পরিমাপের জন্য প্রেরণ করেন তখন খাইবারবাসী ইয়াহুদীরা তাঁকে এ জন্য ঘুষ প্রদান করতে চায় যে, তিনি যেন পরিমাণ কম বলেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেন : ‘তোমরা জেনে রেখ যে, আল্লাহর শপথ! সমস্ত মাখলূকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, পক্ষান্তরে তোমরা আমার নিকট কুকুর ও শূকর হতেও জঘন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা অথবা তোমাদের শত্রুতাকে সামনে রেখে আমি যে সুবিচার হতে সরে পড়ব ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করব, এটা সম্ভব নয়।’ এ কথা শুনে তারা বলে, ‘এর দ্বারাই তো আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।’ এ পূর্ণ হাদীসটি সূরা মায়িদাহর তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, তোমরাতো সাক্ষ্য পরিবর্তন আনয়ন কর, মিথ্যা কথা দ্বারা কার্য সাধন কর, প্রকৃত ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্য দান কর, জিহ্বা বাঁকা করে পেঁচযুক্ত কথা বলে ঘটনা কম-বেশি কর, কিছু গোপন কর ও কিছু প্রকাশ করে থাক। আল্লাহ আরও বলেন :

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودْنَ بِالْكُتُبِ لِيَتَحَسَّبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুক্ষিগত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে, যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৮) তাহলে জেনে রেখ যে,

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِي آثِمٍ قَلْبُهُ

এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৩) সর্বজ্ঞ মহাবিচারক আল্লাহ তা‘আলার সামনে কোন কৌশলই কাজ দিবেনা। সেখানে গিয়ে এর প্রতিদান পাবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন : ‘সর্বোত্তম সাক্ষী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জিজ্ঞাসার পূর্বেই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে।’ (মুসলিম ৩/১৩৪৪) অতঃপর আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের
পূর্ণ খবর রাখেন।

১৩৬। হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যে কেহ আল্লাহ, তদ্বীয় ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।

۱۳۶. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِىۡ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِىۡۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖۙ وَكُتُبِهٖۙ وَرُسُلِهٖۙ وَالْيَوْمِۤ اٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

ঈমান আনার পর পূর্ণ ইয়াকীন থাকতে হবে

মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ঈমানের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। সমস্ত আদেশ ও নিষেধ, সমস্ত শারীয়াত এবং ঈমানের সমুদয় শাখাকে যেন মেনে নেয়। যদি তারা ঈমান এনে থাকে তাহলে তার উপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তিনি তাদেরকে আরও যা কিছু উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন ঐ সব কিছু উপর যেন বিশ্বাস রাখে। প্রত্যেক মুসলিমের **اهْدُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** 'আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন' এ প্রার্থনার ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ওর উপরেই আমাদেরকে অটল রাখুন এবং আমাদের হিদায়াতকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে স্বীয়

সত্তার উপর এবং স্বীয় রাসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرِسُوْلِهِۦ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৮)

وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِۦ 'এ কিতাবের' ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন এবং
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ 'এ কিতাবের' ভাবার্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী নাবীগণের
উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا

بَعِيْدًا যে কেহ আল্লাহকে, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ হিদায়াতের পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে। সুতরাং তাদের সুপথ প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত।

<p>১৩৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর অবিশ্বাসী হয়, পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আবার অবিশ্বাসী হয়, অতঃপর অবিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়, তাহলে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেননা এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেননা।</p>	<p>۱۳۷. اِنَّ الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ءٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اَزْدٰدُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا</p>
<p>১৩৮। মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।</p>	<p>۱۳۸. بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ</p>

	عَذَابًا أَلِيمًا
১৩৯। যারা মু'মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।	۱۳۹. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئْتُمْ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
১৪০। এবং নিশ্চয়ই তিনি এছের মাধ্যমে তোমাদের আদেশ করছেন যে, তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।	۱۴۰. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

মুনাফিকদের চরিত্র এবং তাদের গন্তব্য স্থল

ইরশাদ হচ্ছে, 'যে ঈমান আনার পর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, অতঃপর আবার মু'মিন হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যায়, তারপর কুফরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত

থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, তার প্রার্থনা গৃহীত হবেনা, তার ক্ষমার ও মুক্তির কোন আশা নেই এবং তাকে আল্লাহ তা‘আলা সরল সঠিক পথে আনয়ন করবেননা।’ এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, এ মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, শেষে তাদের অন্তরে মোহর লেগে যায়। তাই তারা মু‘মিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। এদিকে বাহ্যতঃ মু‘মিনদের সাথে মিলেমিশে থাকে, আর ওদিকে কাফিরদের নিকট বসে তাদের সামনে মু‘মিনদের সম্পর্কে উপহাসমূলক কথা বলে আনন্দ উপভোগ করে। তাদেরকে বলে : ‘আমরা মুসলিমদেরকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।’

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের সামনে পেশ করে তাতে তাদের অকৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

أَيَّتُّوْنَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ তোমরা চাও যে, কাফিরদের নিকট যেন তোমাদের সম্মান লাভ হয়। কিন্তু তোমাদের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তারা তোমাদের সাথে প্রতারণা করছে। জেনে রেখ যে, সম্মানের মালিক হচ্ছেন এক এবং অংশীবিহীন আল্লাহ তা‘আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, সম্মান দান করেন। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহরই। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১০) আর একটি আয়াতে রয়েছে :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু‘মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানেনা। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮) ভাবার্থ এই যে, হে মুনাফিকের দল! যদি তোমরা প্রকৃত সম্মান পেতে চাও তাহলে আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে মিলিত হও, তাঁর ইবাদাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় এবং তাঁর নিকট সম্মান যাঞ্চা কর। তাহলেই তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে বলেন, ‘আমি যখন তোমাদেরকে নিষেধ করেছি যে, যে মাজলিসে আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ওগুলিকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তোমরা সেই মাজলিসে বসনা। এরপরেও যদি তোমরা ঐ রূপ মাজলিসে অংশগ্রহণ কর তাহলে তোমাদেরকেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে এবং তাদের পায়ে তোমরাও

অংশীদার হবে।' এ আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে মাক্কায়ে অবতীর্ণ সূরা আন'আমের এ আয়াতটি :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ تَخُوضُونَ فِيْءِ آٰيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬৮)

মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন : এ আয়াতের **إِذَا مَثَلُهُمْ** এ ঘোষণাটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

ওদের (মুনাফিকদের) যখন বিচার হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পরবেনা, কিন্তু ওদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন :

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। অর্থাৎ যেমন এ মুনাফিকরা এখানে ঐ কাফিরদের কুফরীতে অংশীদার রয়েছে, তেমনই কিয়ামাতের দিন চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে, কয়েদখানার লৌহ শৃংখলে, গরম পানি ও রক্ত-পূজ পান করায় তাদের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের সকলকেই একই সাথে চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা শুনিতে দেয়া হবে।

১৪১। ওরা এমন যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে জয়লাভ কর তাহলে তারা বলে : আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? এবং যদি ওটা অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে

۱۴۱. الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ

তাহলে বলে : আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? অতঃপর আল্লাহ উত্থান দিবসে তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন; এবং আল্লাহ কখনও মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা।

لِّلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ
لِّلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

অবিশ্বাসী মুনাফিকরা সব সময় পতন ও অনিষ্টের জন্য মুসলিমদের পিছনে লেগে থাকে

এখানে মুনাফিকদের মন্দ অন্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সব সময় মুসলিমদের ধ্বংস ও অবনতির অনুসন্ধান লেগে থাকে। কোন জিহাদে মুসলিমরা বিজয় লাভ করলে তারা নিজেদেরকে মুসলিমদের বন্ধু রূপে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট এসে বলে : ‘আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা?’ পক্ষান্তরে যদি কোন সময় মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে জয়যুক্ত করেন তাহলে তারা তাদের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে বলে : ‘আমরা তো গোপনে তোমাদেরকেই সাহায্য করেছি এবং সর্বদা মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছি। এটা ছিল আমাদের একটা কৌশল যার বলে আজ তোমরা বিজয় লাভ করলে।’ এটা হচ্ছে তাদের কাজ যে, তারা দু’নৌকায় পা দিয়ে থাকে। যদিও তারা তাদের এ কৌশলকে নিজেদের পক্ষে গৌরবের কারণ মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বেঈমানীর পরিচায়ক। কাঁচা রং কত দিন থাকবে? গাজরের বাঁশী কত দিন বাজবে? কাগজের নৌকাই বা কত দিন চলবে? এমনই এক সময় আসবে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। স্বীয় কৃতকর্মের জন্য তারা আফসোস করবে। স্বীয় লজ্জাজনক কাজের কারণে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে। তারা আল্লাহ তা‘আলার সত্য মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সমস্ত মঙ্গল হতে নিরাশ

হয়ে যাবে। সেদিন তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। তাদের গোপনীয়তা সেদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। সমস্ত রহস্য সেদিন উদ্ঘাটিত হবে। তাদের জঘন্য কাজ অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে সামনে এসে হাযির হবে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
মু'মিনদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা। এক ব্যক্তি আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আরও কাছে এসো, আরও কাছে এসো। ভাবার্থ ছিল এই যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা। (তাফসীর আবদুর রায্বাক ১/১৭৫) অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা এখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এমন কোন সময় আনয়ন করবেন যখন কাফিরেরা মুসলিমদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়ার মত শক্তি অর্জন করতে পারবে। পৃথিবীতে কোন সময় হয়তো তারা বিজয়ী হয়ে যায় সেটা অন্য কথা। কিন্তু পরিণামে জয় মুসলিমদেরই, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫১) এ অর্থের মধ্যে একটা সৌন্দর্য এই রয়েছে যে, মুনাফিকরা ঐ সময় আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে সময়ে তারা মুসলিমদের ধ্বংস কামনা করছিল। তাতে তাদেরকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে তিনি মুসলিমদের উপর এমনভাবে বিজয়ী করবেননা, যার ফলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তারা যে ভয়ে মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্যভাবে মিশতে পারছিলনা সেই ভয়কেও তিনি দূর করে দিয়ে বলেন যে, মুসলিমরা যে ভু-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এটা যেন তারা মনে না করে। এ ভাবার্থকেই তিনি এ আয়াতে পরিষ্কার করেছেন।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَشِيَ أَنْ
تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا
عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَلْدِمِينَ

এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে : আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫২)

১৪২। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।

۱۴۲. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

১৪৩। এরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে - তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা।

۱۴۳. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে

এ (৯ : ২) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا সূরা বাকারাহর প্রথমেও আয়াতটির তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এখানেও বর্ণনা করা হচ্ছে : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ এ নির্বোধ মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করতে রয়েছে, অথচ তিনি তাদের অন্তরের সমস্ত কথা সম্যক অবগত রয়েছেন। অজ্ঞতা, দুর্বল মন এবং স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ মুনাফিকরা মনে করছে যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়ায় চলছে এবং মুসলিমদের মধ্যে চলছে, তদ্রূপ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপেও চলবে। যেমন কুরআনে রয়েছে :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যে রূপ শপথ তোমাদের নিকট করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৮) কিন্তু সেই সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সামনে তাদের এ বাজে শপথ কোনই কাজে আসবেনা। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে প্রতারণা প্রত্যর্পণকারী। তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তাই তারা আজ বেড়ে চলেছে ও ফুলে-ফেপে উঠেছে এবং এটাকে তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করছে। কিয়ামাতের দিনও তাদের অবস্থা এমনই হবে। তারা মুসলিমদের আলোকের উপর নির্ভর করে থাকবে। মুসলিমরা সামনে এগিয়ে যাবে। এ মুনাফিকরা তখন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ
بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে : তোমরা আমাদের জন্য একটু খাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে : তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৩) তারা পিছনে ফিরবে এমন সময় তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। মুসলিমদের দিকে থাকবে করুণা এবং তাদের দিকে থাকবে দুঃখ ও বেদনা। হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি শোনাতে আল্লাহ তা'আলা সেটা শুনিতে দিবেন এবং যে রিয়াকারী দেখানোর আশা করবে আল্লাহ তা'আলা সেটা দেখিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায়

তখন তারা শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করা হতে তারা বহু দূরে রয়েছে। তারা প্রভুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনা। তারা শুধু মানুষের মধ্যে সালাত আদায়কারী রূপে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে। তাহলে এ অস্থিরচিত্ত মানুষেরা সালাতে কি পাবে? এ কারণেই তারা ঐ সালাতে অনুপস্থিত থাকে যে সালাতে (অন্ধকারের কারণে) মানুষ একে অপরকে কম দেখতে পায়। যেমন ইশা ও ফাজরের সালাত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী সালাত হচ্ছে ইশা ও ফাজরের সালাত। যদি তারা এ সালাতের ফাযীলাতের কথা অন্তরে বিশ্বাস করত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই এ সালাতে হাযির হত। আমি ইচ্ছা করি যে, তাকবীর দেয়ার পর কেহকে ইমামতির স্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, আমি লোকদেরকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে বলি এবং যারা জামাআতে হাযির হয়না ঐ লোকদেরকে বাড়ীতে রাখা অবস্থায় চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিই এবং তাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিই।’ (ফাতহুল বারী ২/৫৩, মুসলিম ১/৪৫১) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহর শপথ! যদি তাদের একটি চর্বিয়ুক্ত অস্থি বা দু’টি উত্তম খুর পাওয়ার আশা থাকত তাহলে তারা দৌড়ে চলে আসত। বাড়ীতে যেসব মহিলা ও শিশু অবস্থান করে তারা যদি সেখানে না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিতাম।’ (ফাতহুল বারী ২/২৪৮, মুসলিম ১/৩২৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

অর্থাৎ সালাতে তাদের মোটেই মন বসেনা। তারা যে কথা বলে তা নিজেই বুঝেনা, বরং তারা উদাসীনভাবে সালাত আদায় করে থাকে। ইমাম মালিক (রহঃ) ‘আতা ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইহা হল মুনাফিকদের সালাত, ইহা হল মুনাফিকদের সালাত, ইহা হল মুনাফিকদের সালাত। পশ্চিম দিগন্তে শাইতানের দু’টি শিংয়ের মাঝখান দিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে থাকে। অতঃপর দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়া করে চার রাক‘আত (আসর) সালাত আদায় করে; তাতে খুব কমই আল্লাহর নাম স্মরণ

করা হয়। (মুয়াত্তা ১/২২০, মুসলিম ১/৪৩৪, তিরমিযী ১/৪৯৭, নাসাঈ ১/২৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ মুনাফিক সদা স্তম্ভিত ও হতভম্ব অবস্থায় কালাতিপাত করে। ঈমান ও কুফরীর মধ্যে তাদের মন অস্থির থাকে। তারা না স্পষ্টভাবে মুসলিমদের সঙ্গী, না সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের সাথী। কখনও ঈমানের জ্যোতি অন্তরে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। আবার কখনও কুফরীর অন্ধকার তাদের উপর জয়যুক্ত হলে তারা ঈমান হতে দূরে সরে পড়ে। না তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের দিকে রয়েছে, না ইয়াহুদীদের পক্ষে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মুনাফিকের অবস্থা হচ্ছে দু’টি পালের মধ্যস্থিত ছাগলের অবস্থার ন্যায় যা ভ্যা-ভ্যা করতে করতে কখনও এ পালের দিকে দৌড় দেয় এবং কখনও ঐপালের দিকে দৌড় দেয়। সে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি যে, এর পিছনে যাবে নাকি ওর পিছনে যাবে।’ (মুসলিম ৪/২১৪৬, তাবারী ৯/৩৩৩) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَهُ مَنْ يُضِلُّهُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, তার পথ প্রদর্শক আর কে আছে? আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদেরকে তাদের জঘন্য কাজের কারণে সঠিক পথ হতে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিষ্ক্ষেপ করেছেন। এখন আর কেহ তাকে সঠিক পথের উপর আনতেও পারবেনা এবং তার মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবেনা। আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার বিপরীত কাজ কেহ করতে পারবেনা। তিনি সকলেরই শাসনকর্তা। তাঁর কাজের জন্য জবাবদিহি চাওয়ারও কেহ নেই। তাঁর উপর কারও শাসন ক্ষমতা চলেনা।

১৪৪। হে মু‘মিনগণ! তোমরা মু‘মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

١٤٤. يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

<p>১৪৫। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা।</p>	<p>١٤٥. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا</p>
<p>১৪৬। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ও আল্লাহর ধর্মে বিশ্বদ্ধ হয়, ফলতঃ তারাই মু'মিনদের সঙ্গী এবং অচিরেই আল্লাহ মু'মিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।</p>	<p>١٤٦. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمُ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا</p>
<p>১৪৭। আল্লাহ কেনইবা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর? এবং আল্লাহ তো অতিশয় গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।</p>	<p>١٤٧. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا</p>

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখতে, তাদের সাথে সর্বদা উঠাবসা করতে, তাদের সাথে শলা-পরামর্শ করতে, মুসলিমদের গুপ্ত কথা তাদের নিকট প্রকাশ করতে এবং তাদের সাথে গোপন

সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে নিষেধ করছেন। অন্য আয়াতে আছে :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثِقَلٌ وَيُحَذِّرُكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ

মু‘মিনগণ যেন মু‘মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৮) অর্থাৎ তোমরা যদি তাঁর অবাধ্য হও তাহলে তোমাদের তাঁর শাস্তির ব্যাপারে ভীত হওয়া উচিত। ‘মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে’ আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : কুরআনুল হাকীমে যেখানেই এরূপ ইবাদাতের মধ্যে سُلْطَان শব্দ রয়েছে সেখানে তার ভাবার্থ হচ্ছে প্রামাণ্য দলীল। এ বর্ণনাটি সঠিক বলে মন্তব্য পাওয়া যায় মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং নাযর ইব্ন আরাবী (রহঃ) হতেও।

তাওবাহ না করলে মুনাফিক ও কাফিরেরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে

এরপর আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, إِنَّ
التَّارِ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ তারা তাদের কঠিন কুফরীর কারণে
জাহান্নামের একেবারে নিম্ন স্তরে প্রবেশ করবে। دَرَجَةٌ শব্দটি হচ্ছে دَرَكُ শব্দের
বিপরীত। জান্নাতের ‘দারক’ রয়েছে একটির উপর আরেকটি। পক্ষান্তরে
জাহান্নামের ‘দারক’ রয়েছে একটির নীচে অপরটি। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন
যে, মুনাফিকদেরকে আগুনের বাস্কে পুরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা
ওর মধ্যে জ্বলতে পুড়তে থাকবে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এ বাস্কাটি হবে

লোহার, যাতে আগুন দেয়া মাত্রই আগুন হয়ে যাবে এবং তার চার দিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। (তাবারী ৯/৩৩৯) কেহ এমন হবেনা যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে বা তাকে জাহান্নাম হতে বের করতে পারে অথবা শাস্তি কিছু কম করাতে পারে। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই তাওবাহ করবে, লজ্জিত হবে এবং ঐ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অতঃপর সংশোধিত হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে সৎকাজ সম্পাদন করবে, রিয়াকে আন্তরিকতার সাথে পরিহার করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে, তিনি তাদের তাওবাহ কবুল করবেন, তাদেরকে খাঁটি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং উত্তম সাওয়াবের অধিকারী করবেন। মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা তোমাদের দীনকে খাঁটি কর, তাহলে অল্প আমলই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।'

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন বেনিয়ায, তিনি বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে চাননা। তবে হ্যাঁ, যদি সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পাপকাজ করতে থাকে তাহলে অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে।' তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'যদি তোমরা তোমাদের আমল সুন্দর করেনাও এবং আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহলে কোন কারণ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তিনি পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। কার আমল খাঁটি ও গ্রহণযোগ্য তা তিনি ভালই জানেন। কার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং কার অন্তর ঈমানশূন্য তিনি তাও জানেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

পঞ্চম পারা সমাপ্ত।

<p>১৪৮। আল্লাহ কোন মন্দ কথার প্রচারণা ভালবাসেননা, তবে কেহ অত্যাচারিত হয়ে থাকলে তার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।</p>	<p>١٤٨. لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا</p>
<p>১৪৯। যদি তোমরা সৎ কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে</p>	<p>١٤٩. إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ</p>

কর অথবা যদি তোমরা
অপরাধ ক্ষমা করে দাও
তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ
নিজেও ক্ষমাকারী,
সর্বশক্তিমান।

أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفْوَاً قَدِيرًا

যে অন্যায় করেছে তাকে গালি দেয়া যাবে

ইবন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, কোন মুসলিমের জন্য বদ দু‘আ করা বৈধ নয়। তবে যার উপর অত্যাচার করা হয় সে অত্যাচারীর জন্য বদ দু‘আ করতে পারে। কিন্তু সেও যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে ফাযীলাত তাতেই রয়েছে। (তাবারী ৯/৩৪৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তার জন্য বদ দু‘আ করা উচিত নয়, বরং নিজের দু‘আটি পাঠ করা উচিত :

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَيْهِ وَاسْتَخْرِجْ حَقِّي مِنْهُ

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার উপর সাহায্য করুন এবং তার নিকট হতে আমার প্রাপ্য বের করে দিন।’ (তাবারী ৯/৩৪৪) এ মনীযী হতেই বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারীর জন্য বদ দু‘আ করার অনুমতি যদিও অত্যাচারিত ব্যক্তির রয়েছে, কিন্তু সেটা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আবদুল কারীম ইবনে মালিক জাযারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তি গালি দিবে অর্থাৎ মন্দ বলবে তাকে মন্দ বলা যাবে, কিন্তু কেহ মিথ্যা বললে তাকে অপবাদ দেয়া যাবেনা। অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ : ৪১) সুনান আবু দাউদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘দু‘জন গালিদাতার মধ্যে যে প্রথম গালগালি শুরু করে তার উপর পাপ বর্তাবে, যতক্ষণ না যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে প্রতিউত্তরে সীমা অতিক্রম করে।’ (আবু দাউদ ৪৮৯৪) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوَاً قَدِيرًا

‘হে লোকসকল! যদি তোমরা কোন সৎ কাজ প্রকাশ কর বা গোপন কর, কিংবা

তোমার উপর কেহ হয়ত অত্যাচার করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমার জন্য রয়েছে অনেক বড় সাওয়াব ও মহা প্রতিদান। আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী এবং বান্দার মধ্যেও তিনি এ অভ্যাস পছন্দ করেন। প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন।’ একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আরশ বহনকারী মালাইকা আল্লাহ তা‘আলার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। কেহ বলেন :

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

‘হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যে, আপনি জানা সত্ত্বেও সহনশীলতা প্রদর্শন করছেন।’ আবার কেহ কেহ বলেন :

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

‘হে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাকারী প্রভু! সমস্ত পবিত্রতা আপনার সত্তার জন্যই উপযুক্ত।’

সহীহ হাদীসে রয়েছে : ‘সাদাকাহ ও খাইরাতেস কারণে কারও সম্পদ কমে যায়না। ক্ষমা ও ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা‘আলা সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১)

১৫০। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে -

۱۵۰. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

<p>১৫১। ওরাই প্রকৃত অবিশ্বাসী, এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।</p>	<p>۱۵۱. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا</p>
<p>১৫২। এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা, আল্লাহ শীঘ্রই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।</p>	<p>۱۵۲. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا</p>

নাবীদের কেহকে স্বীকার করা এবং কেহকে অস্বীকার করা কুফরী সমতুল্য

এ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে যে, মাত্র একজন নাবীকেও যে মানেনা সেও কাফির। ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নাবীকেই মানতো। খৃষ্টানরা শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সমস্ত নাবীকেই বিশ্বাস করত। সামেরীরা ইউশা’র (আঃ) পরে অন্য কোন নাবীকে (আঃ) স্বীকার করতনা। ইউশা (আঃ) মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) খলীফা ছিলেন। মাজুসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নাবী যারাদাশতকে স্বীকার করত। কিন্তু তারা যখন তাঁর শারীয়াতকে অস্বীকার করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের শারীয়াতকে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন। সুতরাং এ লোকগুলো যে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করত অর্থাৎ কোন নাবীকে মানত ও কোন নাবীকে মানতনা, তা যে আল্লাহ প্রদত্ত দলীলের উপর ভিত্তি করে তা নয়। বরং শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা, অত্যন্ত গোঁড়ামি এবং পূর্ব পুরুষের কথার উপর অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই তারা এরূপ করত। এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি মাত্র একজন নাবীকে মানেনা সে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সমস্ত নাবীকেই অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা নিঃসন্দেহেই কাফির। প্রকৃতপক্ষে ‘শারঈ’ ঈমান তাদের কারও উপরেই নেই, বরং রয়েছে শুধু গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির ঈমান। আর এরূপ ঈমান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এ কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। কেননা যাদের উপর ঈমান না এনে তাঁদের মর্যাদার হানি করেছে তার প্রতিফল এটাই যে, তাদেরকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যে তাদের উপর ঈমান আনছে না তা তাদের চিন্তা-শক্তির অভাবের কারণেই হোক বা সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর ইহলৌকিক কোন স্বার্থের কারণেই হোক, যেমন ইয়াহুদী আলেমদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এ অভ্যাস ছিল যে, তারা একমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নাবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা নিপতিত হল এবং তারা আল্লাহর কোপে পতিত হল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৬১) অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের প্রশংসা করা হচ্ছে :

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

তা‘আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সমস্ত নাবীকেই বিশ্বাস করে এবং তাঁদের মধ্যে কোন ভিন্নতা সৃষ্টি করেনা। আল্লাহ তা‘আলার শেষ গ্রন্থ কুরআনুল হাকীমের উপর ঈমান এনে অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবকেও তারা বিশ্বাস করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ

রাসূল তার রাক্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু‘মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারাহ,

২ : ২৮৫) এরপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার কারণে সত্বরই প্রতিদান প্রদান করবেন। তারা যদি কোন পাপকাজও করে, তবুও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৫৩। আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল কর, পরন্তু তারা মুসার নিকট এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর; অতঃপর তাদের অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল, অতঃপর তাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ওটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম, এবং মুসাকে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছিলাম।

১৫৩. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ ۖ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ۖ فَعَفَوْنَا عَنِ ذَلِكَ ۖ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا

১৫৪। এবং আমি তাদের প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের উপর ত্বর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম অবনত শিরে দ্বারে প্রবেশ

১৫৪. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا

কর। এবং তাদেরকে আরও বলেছিলাম, শনিবারের সীমা অতিক্রম করনা। এভাবে তাদের নিকট হতে কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম।

الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

ইয়াহুদীদের একগুঁয়েমী

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, মূসা (আঃ) যেমন তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এনেছিলেন, তদ্রূপ আপনিও পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ন করুন। (তাবারী ৯/৩৫৬, ৩৫৭) এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল, আপনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ন করুন যাতে আপনাকে নাবীরূপে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকে। (তাবারী ৯/৩৫৭) এরূপ প্রশ্ন তারা বিদ্রূপ, অবাধ্যতা এবং কুফরীর উদ্দেশ্যেই করেছিল। যেমন মাক্কাবাসী কুরাইশরাও তাঁকে অনুরূপ কথা বলেছিল যা সূরা ইসরায উল্লিখিত আছে। তারা বলেছিল :

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا

আর তারা বলে : কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯০)

সুতরাং আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তাদের এ অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের কারণে তুমি মোটেই দুঃখিত হবেনা। তাদের এটা পুরাতন অভ্যাস। তারা মূসাকে (আঃ) এর চেয়েও জঘন্যতর কথা বলেছিল।

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ

الصَّاعِقَةُ بَظْلَمِهِمْ তারা তাঁকে বলেছিল : আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। এ অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে মন্তব্যের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বজ্রপাত তাদের উপর পতিত হয়েছিল, যেমন সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذْتَكُمُ الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ
مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

এবং যখন তোমরা বলেছিলে : হে মুসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা, তখন বজ্রপাত তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৫৫-৫৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ
প্রত্যক্ষ করার পরেও তারা গো বৎসের পূজা শুরু করে দেয়। মিসরে তাদের শত্রু ফির'আউনের মুসার (আঃ) মুকাবিলায় ডুবে মরা, তার সমস্ত সৈন্যের দুর্ভাগ্যের মৃত্যুবরণ করা, তাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে যাওয়া, এ সবগুলোই তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। তথাপি সেখান হতে কিছু দূর গিয়েই তারা মূর্তি পূজকদেরকে মূর্তিপূজা করতে দেখে স্বীয় নাবীকে (আঃ) বলে :

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
বানিয়ে দাও।' এর পূর্ণ বিবরণ সূরা আ'রাফ এবং সূরা তাহায়ও রয়েছে।

অতঃপর মুসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের তাওবাহ কবুল হওয়ার পছা এই বলে দেয়া হয় যে, যারা গো-বৎসের পূজা করেনি তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা করবে। তাদের দ্বারা আল্লাহর আদেশ পালিত হলে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তখন তাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং পরে মৃতদেরকেও জীবিত করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন :

فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا
দিয়েছি এবং এ মহাপাপকেও আমি ক্ষমা করেছি। আর মুসাকে (আঃ) প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছি।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ
যখন তারা তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য করতে অস্বীকার করে এবং মুসার (আঃ) আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হয় তখন

<p>জন্য; হ্যাঁ - তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এ কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করেনা,</p>	<p>غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا</p>
<p>১৫৬। এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য।</p>	<p>১৫৬. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ ۖ هَتَّنَا عَظِيمًا</p>
<p>১৫৭। এবং ‘আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি’ বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি।</p>	<p>১৫৭. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا</p>
<p>১৫৮। পরন্তু আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।</p>	<p>১৫৮. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا</p>
<p>১৫৯। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে</p>	<p>১৫৯. وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا</p>

ইয়াহুদীদের বিভিন্ন পাপের বর্ণনা

আহলে কিতাবের ঐ পাপসমূহের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার করুণা হতে দূরে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েছে এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ, দলীল এবং নাবীগণের মু'জিয়াকে অস্বীকার করে।

وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيٍ حَقٌّ তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তারা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসূলগণের একটি বিরাট দল তাদের হাতে নিহত হন। قُلُوبُنَا غُلْفٌ চতুর্থ এই যে, তারা বলে, আমাদের অন্তর পর্দায় ঢেকে রয়েছে, যেমনটি বলেছেন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। (তাবারী ৯/৩৬৪) মুশরিকরা বলেছিল :

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ

তারা বলে : তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৫) আবার এও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : আমাদের অন্তর হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যার পাত্র। সেই পাত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথাকে খণ্ডন করে বলেন :

بَلْ طَعَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

এটা নয় বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেহর দিয়েছেন। প্রথম তাফসীরের ভিত্তিতে ভাবার্থ হবে : তারা ওয়র পেশ করে বলেছিল, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা পড়ে গেছে বলে আমরা নাবীর (আঃ) কথাগুলি মনে রাখতে পারিনা। তখন আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন : 'এরূপ নয়, বরং তোমাদের কুফরীর কারণে তোমাদের

অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।’ দ্বিতীয় তাফসীরের ভিত্তিতে তো ভাবার্থ সবদিক দিয়েই স্পষ্ট। সূরা বাকারাহর তাফসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পরিণাম হিসাবে বলা হয়েছে যে, এখন তাদের অন্তর কুফরী, অবাধ্যতা এবং ঈমানের স্বল্পতার উপরেই থাকবে।

মারইয়াম সম্পর্কে ইয়াহুদীদের জঘন্য অপবাদ এবং ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার তাদের মিথ্যা দাবী

وَبِكْفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا তাদের পঞ্চম বড় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সতীসাধ্বী নারী মারইয়ামের (আঃ) উপরও ব্যভিচারের জঘন্যতম অপবাদ দেয়। আলী ইবন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীরা ঈসার (আঃ) মাকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিয়েছিল। (তাবারী ৯/৩৬৭) সুদী (রহঃ), যুয়াইবির (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য অনেকে একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৯/৩৬৭) ইয়াহুদীরা এ কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি যে, এ ব্যভিচারের মাধ্যমেই ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। কেহ কেহ আবার আর এক পা অগ্রসর হয়ে বলে যে, এ ব্যভিচার ঋতু অবস্থায় হয়েছিল। তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার কিয়ামাত পর্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তাঁর মনোনীত বান্দাও তাদের কু-কথা হতে রক্ষা পাননি। إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ তাদের ষষ্ঠ অপরাধ এই যে, তারা বিদ্রূপ করে এবং গৌরব বোধ করে বলেছিল, ‘আমরা ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছি।’ যেমন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে বলেছিল :

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

তারা বলে : ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই উম্মাদ। (সূরা হিজর, ১৫ : ৬)

পূর্ণ ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তা‘আলা ঈসাকে (আঃ) নাবীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বড় বড় মু‘জিয়া প্রদান করেন, যেমন জন্মান্তকে চক্ষুদান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরী করে তার ভিতর ফুক দিয়ে তাকে জীবন্ত পাখি করে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি, তখন ইয়াহুদীরা (তাদের প্রতি আল্লাহর লা‘নত বর্ষিত হোক) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং

তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায় ও সর্ব প্রকারের কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। তারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। কোন শহরে অনেক দিন ধরে নিরাপদে অবস্থানও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। সারা জীবন তিনি মায়েস সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অবস্থায় কাটিয়ে দেন। সে অবস্থায়ও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। ঐ যুগের দামেস্কের বাদশাহর নিকট তিনি গমন করেন। সে বাদশাহ ছিল তারকা পূজক। সে সময় ঐ মাযহাবের লোককে ‘ইউনান’ বলা হত। ইয়াহুদীরা এখানে এসে ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে। তারা বলে, ‘এ লোকটি বড়ই বিবাদী। সে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং জনগণকে বিপথে চালিত করছে। প্রত্যহ নতুন নতুন গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে ও শান্তি ভঙ্গ করছে। সে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে।’

বাদশাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত স্বীয় শাসনকর্তার নিকট নির্দেশনামা প্রেরণ করে যে, সে যেন ঈসাকে (আঃ) খেঁফতার করে শূলে চড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মস্তকোপরি কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং এভাবে জনগণকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। বাদশাহর এ নির্দেশনামা পাঠ করে ঐ শাসনকর্তা ইয়াহুদীদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঘরটি অবরোধ করে যেখানে ঈসা (আঃ) অবস্থান করছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বারোজন বা তেরোজন অথবা সতের জন লোক ছিল। ঐ দিন ছিল শুক্রবার। আসরের পর তারা ঐ ঘরটি অবরোধ করে। যখন ঈসা (আঃ) অনুভব করেন যে, এখন হয় তারাই জোর করে ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে খেঁফতার করে নিয়ে যাবে, না হয় তাঁকেই বাইরে যেতে হবে। তাই তিনি স্বীয় সহচরদেরকে বলেন : ‘তোমাদের মধ্যে কে এটা পছন্দ করবে যে, তার উপর আমার সদৃশ আনয়ন করা হবে অর্থাৎ তার আকার আমার আকারের মত হয়ে যাবে, অতঃপর সে তাদের হাতে খেঁফতার হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাকে মুক্তি দিবেন? আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হচ্ছি।’ এ কথা শুনে এক যুবক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন : ‘আমি এতে সম্মত আছি।’ কিন্তু ঈসা (আঃ) তাকে এক নব্য যুবক লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এ কথাই বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনিই প্রস্তুত হয়ে যান। তখন ঈসাও (আঃ) মেনে নেন এবং দেখতে না দেখতেই আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে তাঁর আকার পরিবর্তিত হয়, আর মনে হয় যে, তিনিই ঈসা (আঃ)। সে সময় ছাদের এক দিকে একটি ছিদ্র প্রকাশিত হয় এবং ঈসার (আঃ) উপর তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা ছেয়ে যায়। ঐ অবস্থায়ই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

যখন আল্লাহ বললেন : হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫৫)

ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর এ লোকগুলো ঘর হতে বেরিয়ে আসে। যে মহান সাহাবীকে ঈসার (আঃ) আকারবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ইয়াহুদীদের দলটি ধরে নেয় এবং রাতারাতিই তাকে শূলের উপর চড়িয়ে দিয়ে তার মাথার উপর কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয়। তখন ইয়াহুদীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারা ঈসাকে (আঃ) হত্যা করে ফেলেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খৃষ্টানদের একটি নির্বোধ দলও ইয়াহুদীদের সুরে সুর মিলিয়ে দেয়। শুধুমাত্র যারা ঈসার (আঃ) সঙ্গে ঐ ঘরে উপস্থিত ছিল তারা নিশ্চিতরূপে জানত যে, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর ইনি হচ্ছেন অমুক ব্যক্তি যিনি নিজ ইচ্ছায় তাঁর স্থানে শহীদ হয়েছেন, তারা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত খৃষ্টানই ইয়াহুদীদের মতই আলাপ আলোচনা করতে থাকে। এমন কি তারা এ কথাও বানিয়ে নেয় যে, ঈসার (আঃ) মাতা মারইয়াম (আঃ) শূলের নীচে বসে কাঁদছিলেন। তারা এ কথাও বলে যে, মারইয়াম (আঃ) সে সময় স্বীয় পুত্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর পরীক্ষা যা তাঁর পূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এ অপপ্রচারকে প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কুরআনের মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করেন এবং স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও বড় মর্যাদাসম্পন্ন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র ও সত্য কালামে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে না কেহ ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছে, আর না তাকে শূলে দিয়েছে। বরং যে ব্যক্তির আকার তাঁরই আকারের ন্যায় করে দেয়া হয়েছিল তাকেই তারা ঈসা (আঃ) মনে করে শূলে দিয়েছিল। আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর মালিক, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সকলের গোপন বিষয় অবগত আছেন, যা তারা প্রকাশ করে অথবা গোপন করে। কখন কি ঘটবে অথবা ঘটেছে তাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যেসব ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ঈসার (আঃ) নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে তারা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট না আছে কোন

দলীল, আর না তাদের আছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তাদের এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এরই সাথে আবার বলে দিয়েছেন :

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ
হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত কথা। বরং প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করেন তখন ঈসা (আঃ) বাড়িতে আসেন। সেই সময় তাঁর ঘরে বারোজন সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর চুল হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তিনি তাঁর সহচরদেরকে বলেন : ‘তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছে যারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু বারো বার আমার সঙ্গে কুফরী করবে।’ অতঃপর তিনি বলেন : ‘তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে পছন্দ করে যে, আমার মত তার আকার করে দেয়া হবে এবং আমার স্থলে তাকে হত্যা করা হবে এবং সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। তখন এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন। ঈসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে আমার সাহায্যকারী হবে? এবারও ঐ যুবকই দাঁড়িয়ে গেল এবং ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন। কিন্তু যুবকটি আবারও দাঁড়িয়ে গেলে ঈসা (আঃ) বললেন, তুমিই হবে সেই ব্যক্তি। অতঃপর ঈসার (আঃ) আকৃতি ঐ যুবকের উপর প্রতিফলিত হল এবং ঈসাকে (আঃ) ঘরের ছিদ্র পথে উর্ধ্ব তুলে নেয়া হয়। অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা ঈসাকে (আঃ) খুঁজতে এসে তার চেহারায় রূপান্তরিত ঐ যুবককে দেখতে পায় এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে।

ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেহ কেহ তাঁর সাথে বারো বার কুফরী করে। অতঃপর তাদের তিনটি দল হয়ে যায়। (১) ইয়াকূবিয়্যাহ, (২) নাসতুরিয়্যাহ এবং (৩) মুসলিম। ইয়াকূবিয়্যাহ তো বলতে থাকে, ‘স্বয়ং আল্লাহ আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। যতদিন থাকার তাঁর ইচ্ছা ছিল ততদিন ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠে গেছেন।’ নাসতুরিয়্যাহ বলে, ‘আল্লাহর পুত্র আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে কিছুকাল আমাদের মধ্যে রাখার পর তিনি তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।’ মুসলিমদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তাদের মধ্যে ছিলেন। যতদিন রাখার ইচ্ছা ততদিন তাদের মধ্যে রেখেছেন। অতঃপর নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

পূর্ববর্তী দু'দলের প্রভাব খুব বেশি হয় এবং তারা তৃতীয় সত্য ও ভাল দলটিকে পিষ্ট ও দলিত করতে থাকে। সুতরাং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করে ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৪/১১০) এ বর্ণনাটি সহীহ সনদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আবু কুরাইবের (রহঃ) মাধ্যমে এবং তিনি আবু মুয়াবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ ৬/৪৮৯) সালাফগণের মধ্য থেকে অনেকে বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন তাঁর কোন সাহায্যকারী আছে কি যার উপর তার চেহারা প্রতিফলিত হবে এবং তাকে ঈসা (আঃ) ভেবে হত্যা করা হবে, এ জন্য সে জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হিসাবে থাকবে।

ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে খৃষ্টানরা তাঁর দা'ওয়াতের উপর ঈমান আনবে

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হবেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি আছে। প্রথমতঃ এই যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ যখন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দ্বিতীয়বার ভূপৃষ্ঠে আগমন করবেন তখন সমস্ত মতবাদ উঠে যাবে। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্ম।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে **مَوْتُهُ** এর ভাবার্থ হচ্ছে ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে। (তাবারী ৯/৩৮০) আবু মালিক (রহঃ) বলেন যে, ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন তখন সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনবে।

কিয়ামাতের পূর্বে ঈসার (আঃ) অবতরণ এবং তাঁর কর্ম তৎপরতা

এখন ঐ সব হাদীসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেগুলির মধ্যে রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) শেষ যুগে কিয়ামাতের পূর্বে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং অংশীবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ! অতিসত্ত্বরই তোমাদের মধ্যে ইব্ন মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ত্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, দান সাদাকাহ গ্রহণ করতে কেহ সম্মত হবেনা। ঐ সময় একটি সাজদাহ করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হতে প্রিয়তর হবে।’ অতঃপর হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন :

‘তোমরা ইচ্ছা করলে **وَإِنْ مِّنْ أَهْلٍ لِّلْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ**

الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا এ আয়াতটি পাঠ কর। (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬)

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর (ঈসার (আঃ) উপর) অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে কিয়ামাতের দিন তাদের উপর সাক্ষী হবে। সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। মুসলিম ১/১৩৫) অন্য সনদে এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। তাতে এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘সে সময় সাজদাহ শুধু বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যই হবে।’ তারপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ)

বলেন : ‘তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ কর **وَإِنْ مِّنْ أَهْلٍ لِّلْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ**

قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ ‘ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে।’

মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঈসা (আঃ) ‘আর-রাওহা’ প্রান্তরে হাজ্জের উপর বা উমরার উপর অথবা হাজ্জ ও উমরা দু’টোর উপরই লাঞ্চারে বলবেন’ (আহমাদ ২/৫১৩, মুসলিম ১/১৩৫)

মুসনাদ আহমাদের অন্য হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঈসা ইব্ন মারইয়াম অবতরণ করবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, ত্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার নেতৃত্ব দিবেন এবং আল্লাহ তা‘আলার পথে সম্পদ এত বেশি প্রদান করা হবে যে, কোন গ্রহণকারী পাওয়া যাবেনা। তিনি জিযিয়া কর বাতিল করবেন, ‘আর-রাওহায়’ গমন করবেন এবং সেখান হতে হাজ্জ কিংবা

উমরা পালন অথবা একই সাথে উভয়টিই পালন করার জন্য রওয়ানা হবেন। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র হানযালা (রহঃ) বলেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : ‘ঈসার (আঃ) ইত্তি কালের পূর্বে আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।’ হানযালা (রহঃ) বলেন : ‘আমার জানা নেই যে, এগুলি হাদীসেরই শব্দ, নাকি আবু হুরাইরাহর (রাঃ) নিজের কথা।’ (আহমাদ ২/২৯০)

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন ঈসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতেই হবে?’ (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬, আহমাদ ২/২৭২, মুসলিম ১/১৩৬-১৩৭)

সুনান আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘নাবীগণ (আঃ) সবাই বৈমাত্রের ভাই, তাঁদের মা বিভিন্ন বটে, কিন্তু ধর্ম একই। ঈসার (আঃ) বেশি নিকটবর্তী আমিই। কেননা তাঁর ও আমার মধ্যে কোন নাবী নেই। তিনি অবতীর্ণ হবেন, তোমরা তাঁকে চিনে নাও। তিনি হবেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট ও শ্বেত রক্তিম বর্ণের। তিনি হালকা হলুদ রংয়ের দু’টি বস্ত্র খন্ড পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করবেন। তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝড়তে থাকবে যদিও কোন পানীয় বাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিয়া-কর নিষিদ্ধ করবেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তাঁর যুগে সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর সময়ে শুধু ইসলাম ধর্মই বর্তমান থাকবে এবং আল্লাহ অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্ত করবেন। তাঁর যুগে আল্লাহ আ’আলা মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর সারা জগতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি সিংহ উটের সঙ্গে, চিতা বাঘ গাভীর সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ভেড়ার সঙ্গে একত্রে চরে বেড়াবে। শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করবেনা। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযার সালাত আদায় করাবে। (আবু দাউদ ৪৩২৪, আহমাদ ২/৪০৬, তাবারী ৯/৩৮৮)

তাবুতী ইবন জারীরের এ বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইসলামের জন্য লোকের সঙ্গে জিহাদ করবেন। এ হাদীসের একটি অংশ সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসার (আঃ) বেশি নিকটবর্তী আমিই।’

সহীহ মুসলিমের আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত রোমকগণ ‘আ’মাক’ বা ‘দাবিক’ (সিরিয়ার আলেক্সেন্দ্রিয়ার কাছে দু’টি শহর) দখল না করবে। তাদের মুকাবিলায় মাদীনা হতে মুসলিম সেনাবাহিনী গমন করবে। সে সময় ঐ মুসলিমরা সারা দুনিয়ার লোকের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়পাত্র হবে। যখন তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে তখন রোমকগণ তাদেরকে বলবে : ‘আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা। আমাদের মধ্য হতে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে তোমাদের নিকট চলে এসেছে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। তোমরা তাদের মধ্য হতে সরে যাও।’ তখন মুসলিমরা বলবে : আল্লাহর শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা যে, আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। ঐ মুসলিম সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। আল্লাহ তা‘আলা কখনও তাদের ক্ষমা করবেননা। এক তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা‘আলার কাছে তারা সবচেয়ে উত্তম শহীদ। কিন্তু শেষ তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর জয়লাভ করবে। এরপর তারা আর কোন হাঙ্গামায় পতিত হবেনা। তারা (মুসলিমরা) কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করবে। তারা যাইতুন বৃক্ষের উপর নিজেদের তরবারী ঝুলিয়ে রেখে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। এমন সময় শাইতান চীৎকার করে বলবে : ‘তোমাদের সন্তানদেরকে দাজ্জাল আটক করে ফেলেছে।’ তারা এ মিথ্যা কথা কে সত্য মনে করে ওখান হতে বেরিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যুহ ঠিক করতে থাকবে। এমন সময় সালাতের ইকামাত দেয়া হবে এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইমামতি করবেন। শত্রু বাহিনী যখন মুসলিমদেরকে দেখবে তখন তারা গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাদেরকে ছেড়েও দেন তবুও তারা গলে গলেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হাতে তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং ঈসা (আঃ) স্বীয় বর্ষার রক্ত মুসলিমদেরকে তা দেখাবেন। (মুসলিম ৪/২২২১)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা ইয়াহুদীদেরকে দেখবে এবং হত্যা করতে থাকবে, যতক্ষণ না পাথরসমূহ বলবে : হে মুসলিম! এখানে এক ইয়াহুদী রয়েছে, সুতরাং এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা কর। (মুসলিম ৪/২২৩৮)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ততদিন পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যতদিন মুসলিমেরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করবে এবং তাদেরকে হত্যা না করবে। ইয়াহুদীরা পাথর অথবা গাছের আড়ালে লুকাবে এবং গাছ বলবে : হে মুসলিম! হে আল্লাহর দাস! আমার পিছনে ইয়াহুদী রয়েছে, এসো এবং তাকে হত্যা কর। এর ব্যতিক্রম হল ‘গারাকাদ’ যা হল ইয়াহুদীদের গাছ। (মুসলিম ৪/২২৩৯)

মুসনাদ আহমাদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তারা পরস্পরের মধ্যে কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। ইবরাহীম (আঃ) বলেন : ‘এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।’ মূসাও (আঃ) এরূপই বলেন। কিন্তু ঈসা (আঃ) বলেন : ‘এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কারও নেই। তবে হ্যাঁ, আমার প্রভু আমার নিকট যে অঙ্গীকার করেছেন তা এই যে, দাজ্জাল বের হবে। দু’টি দল তার সঙ্গী হবে। সে আমাকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমনভাবে সীসা গলে যায়। আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি পাথর ও গাছ বলবে : হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে এক কাফির আছে, তাকে হত্যা কর। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করবেন এবং মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজ নিজ গ্রাম ও শহরে ফিরে যাবে। তারপর ইয়াজুয ও মাজুয বের হবে এবং চতুর্দিক হতে তারা আক্রমণ চালাবে। সমস্ত শহরকে তারা ধ্বংস করবে। যেসব স্থান তারা অতিক্রম করবে ঐ সবই ধ্বংস করে দিবে। যে পানির পাশ দিয়ে তারা গমন করবে তার সব পানিই তারা পান করে ফেলবে। লোকেরা পুনরায় আমার নিকট ফিরে আসবে। আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করব। তিনি তখন তাদের সকলকেই একই সাথে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর এত বেশি বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, ঐ সমস্ত মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। সেই সময় কিয়ামাতের সংঘটন এত নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর অবস্থা হয়ে থাকে যে, সকালে নাকি সন্ধ্যায় সন্তান প্রসব হবে অথবা দিনে হবে নাকি রাতে হবে তা তার বাড়ীর লোকেরা জানতে পারেনা।’

সহীহ মুসলিমে নাওয়াস ইব্ন শামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সকালে দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং এমনভাবে তাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং ভয়প্রদ কথা বলছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল না জানি সে মাদীনার খেজুরের বাগানেই লুকিয়ে রয়েছে। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট ফিরে এলে আমাদের চেহারা দেখে আমাদের মনের অবস্থা তিনি বুঝে নেন এবং জিজ্ঞেস করেন : ‘ব্যাপার কি?’ তখন আমরা তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন :

‘তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও আর একটা বেশি ভয় রয়েছে। আমার উপস্থিতিতে যদি সে বের হয় তাহলে আমি তাকে বুঝে নিব। কিন্তু যদি আমার পরে সে বের হয় তাহলে প্রত্যেক মুসলিমকেই তাকে বাধা দিতে হবে। মহান আল্লাহই প্রত্যেক মুসলিমের সাহায্যকারী হবেন। জেনে রেখ, সে কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক হবে, টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এটুকু বুঝে নাও যে, সে দেখতে অনেকটা আবদুল উয্য়া ইব্নে কাতানের মত হবে। তোমাদের যে তাকে দেখবে সে যেন সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলি পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী প্রান্ত হতে বের হবে এবং ডানে-বামে ঘুরে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা (ঈমানের উপরে) খুব অটল থাকবে।’ আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে কতদিন অবস্থান করবে। তিনি বললেন : ‘চল্লিশ দিন। এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের সাধারণ দিনগুলির মত হবে।’ অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিন কি একদিনের সালাতই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন :

‘না, বরং তোমরা অনুমান করে নিবে।’ আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পৃথিবীতে তার চলাচলের গতি কিরূপ দ্রুত হবে? তিনি বললেন : মেঘ যেমন ঝড়ে তাড়িত হয়ে চলতে থাকে। সে একটি গোত্রকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে। তখন সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আদেশ করবে এবং তৎক্ষণাত তাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মোটা তাজা হয়ে যাবে ও খুব বেশি দুধ দিবে।

অতঃপর সে আর এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও অস্বীকার করবে। সে সেখান হতে ফিরে আসবে। পরদিন ভোরে তারা নিঃশব্দ অবস্থায় জাগ্রত হবে এবং তাদের অধিকারে কোন কিছুই থাকবেনা। সে শুষ্ক মরুভূমি অতিক্রম করবে এবং ওকে বলবে, তুমি তোমার সম্পদ বের করে নিয়ে এসো। তখন যমীনের মধ্য হতে ধন-ভাণ্ডার বেরিয়ে আসবে। তখন ধন-ভাণ্ডার মৌমাছির মত তার পিছন পিছন ফিরতে থাকবে। সে একজন নব্য যুবককে আহ্বান করবে এবং তাকে হত্যা করে দু'টুকরো করে এতদূরে নিক্ষেপ করবে যত দূরে একটি তীর চলে যায়। তারপর তাকে ডাক দিবে এবং সে তখন জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে তার নিকট চলে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) পাঠিয়ে দিবেন। তিনি হালকা জাফরান রংয়ের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন মালাক/ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে দামেস্কের পূর্বদিকের সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা ঝুঁকবেন তখন তাঁর মাথা হতে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পানি ঝরে পড়বে এবং যখন তিনি মাথা উত্তোলন করবেন তখন ঐ ফোঁটাগুলি মুক্তার মত গড়িয়ে পড়বে। যে কাফির পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস পৌঁছবে সে মরে যাবে এবং তাঁর নিঃশ্বাস ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে থাকে।

তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং (ফিলিস্তিনে) 'লুদ' নামক স্থানে তাকে ধরে ফেলে সেখানেই হত্যা করবেন। তারপর তিনি ঐ অবস্থায়ও যারা আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা পেয়ে যাবে সেই লোকদের নিকট আসবেন। তিনি তাদের চেহারা হাত ফিরিয়ে দিবেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঈসার (আঃ) নিকট অহী আসবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেন : 'আমি আমার এমন বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছি যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেহই করতে পারবেনা। তুমি আমার এ বিশিষ্ট বান্দাদেরকে তূর পর্বতের (সিনাই পাহাড়ে, যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন) নিকট নিয়ে যাও।' তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হবে এবং তারা চতুর্দিক হতে লাফাতে লাফাতে চলে আসবে। তাদের প্রথম দলটি 'বাহীরা-ই তাবারিয়া' নামক জলাশয়ে আসবে এবং ওর সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। যখন তাদের শেষ দলটি আসবে তখন তারা ওটাকে এমন শুষ্ক অবস্থায় পাবে যে, তারা বলবে : সম্ভবতঃ এখানে কোন সময় পানি ছিল। ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনগণ সেখানে এমনভাবে অবরুদ্ধ থাকবেন যে, একটি বলদের মাথাও তাঁদের নিকট এমন পছন্দনীয় মনে হবে যেমন আজ তোমাদের নিকট একশটি স্বর্ণমুদ্রা

পছন্দনীয়। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথের লোকজন আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা 'নাযাফ' নামক এক ধরনের পোকা ইয়াজুজ মাজুজের ঘাড়ে সৃষ্টি করবেন। ফলে পরদিন ভোরে দেখা যাবে যে, তারা সবাই মারা গেছে। মনে হবে যেন তারা ছিল একটি দেহের প্রাণ।

অতঃপর ঈসা (আঃ) স্বীয় সঙ্গীগণসহ নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করবেন। কিন্তু যমীনে এক হাত পরিমাণ জায়গাও এমন পাবেননা যা তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ হতে শূন্য থাকবে। পুনরায় তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা উটের ঘাড়ের সমান এক প্রকার বৃহদাকার পাখি পাঠিয়ে দিবেন। ঐ পাখিগুলি তাদের (ইয়াজুয মাজুযদের) মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন যে মাটির ঘর-বাড়ী অথবা পশুর পশম কোন কিছুই এর থেকে রেহাই পাবেনা। এর ফলে পৃথিবী এমন পরিষ্কার হবে যেন মনে হবে ঝকঝকে আয়না। তারপর যমীনকে শস্য এবং ফল উৎপাদনের ও বারাকাত ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হবে। সেদিন একটি ডালিম এক দল লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তারা সবাই ওর বাকলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ট্রী এত পরিমাণ দুধ দিবে যা বড় একটি দলের পান করার জন্য যথেষ্ট হবে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এক মৃদু মন্দ বাতাস প্রেরণ করবেন যা মুসলিমদের বাহুর নিচ দিয়ে চলে যাবে। ফলে প্রতিটি মু'মিন মুসলিমের জান কবয হয়ে যাবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরা বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মত জনসমক্ষে যৌনকাজে লিপ্ত থাকবে। তাদের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে। (মুসলিম ৪/২২৫০) মুসনাদ আহমাদে এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। (আহমাদ ৪/১৮১, আবু দাউদ ৪/৪৯৬, তিরমিযী ৬/৪৯৯, নাসাই ৫/১৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৫৬) ওটা **حَتَّىٰ إِذَا فُشِّتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ** (২১ : ৯৬) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াকুব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়াহ ইব্ন মাসউদ আশ-শাকাফি (রহঃ) বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) এক লোককে প্রশ্ন করতে শুনেছি : এ কেমন হাদীস বর্ণনা করছেন যে, আপনি নাকি দাবী করছেন যে, অমুক তারিখ কিয়ামাত সংঘটিত হবে? তিনি তখন 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর বললেন : 'আমার ইচ্ছা ছিল যে, আর কেহকে কোন হাদীস শোনাবনা। আমি তো এ কথা বলেছিলাম যে, শীঘ্রই তোমরা বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে,

যেমন বাইতুল্লাহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং এই হবে, এই হবে ইত্যাদি।’ অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘দাজ্জাল বের হবে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমার জানা নেই যে, সেটা চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর হবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়া ইবনে মাসউদের (রাঃ) মত। তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তারপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন মিলে মিশে থাকবে যে, দু’জনের মধ্যে মোটেই কোন শত্রুতা থাকবেনা। অতঃপর সিরিয়ার দিক হতে একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে, যা সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবে। যার অন্তরে অণু পরিমাণও সততা বা ঈমান থাকবে সে পর্বতের গুহায় অবস্থান করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরাই বেঁচে থাকবে, যারা পাখীর ন্যায় হালকা হবে এবং পশুর মত তাদের আচরণ হবে। ভাল ও মন্দে মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি তাদের থাকবেনা। তাদের নিকট অভিশপ্ত শাইতান উপস্থিত হয়ে বলবে, তোমরা কি আমাকে অনুসরণ করবে? তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি আমাদেরকে কি করতে আদেশ করছ? সে তখন মূর্তি পূজা করতে আদেশ করবে। তখন তাদের খাদ্য সম্ভার অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং তাদের জীবন ধারণের মান অনেক উন্নত হবে। তখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যাদের কাছে শব্দ পৌঁছবে তারা এদিক ওদিক মাথা বুকিয়ে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে। একটি লোক যে তার উষ্ট্রগুলোকে পানি পান করানোর জন্য তাদের চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে সে‘ই সর্বপ্রথম শিঙ্গার শব্দ শুনতে পাবে। এর ফলে সে এবং অন্য সমস্ত লোক অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

মোট কথা, সকলেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা হবে শিশিরের বা ছায়ার মত। তার ফলে দ্বিতীয়বার দেহ সৃষ্টি হবে। তারপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সবাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে : ‘হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে চল।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَقُفُّوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২৪) এরপর বলা হবে, ‘জাহান্নামের অংশ বের করে নাও।’ জিজ্ঞেস করা হবে : ‘কত জনের মধ্য হতে কত জনকে?’ উত্তরে বলা হবে : ‘প্রতি হাজারে নয়শ’ নিরানব্বই জনকে’। এটা ঐ দিন :

يَوْمًا تَجْعَلُ الْوِلَدَٰنَ شِيبًا

এটা এমন দিন যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে। (সূরা মুযায্মিল, ৭৩ : ১৭) এবং অন্যত্র বলা হয়েছে :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

এটা এমন দিন যাতে পায়ের গোছা খুলে যাবে। (সূরা কলম, ৬৮ : ৪২)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আরাফাহ মাঠ হতে আসার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের এক মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন করেন। সে সময় সেখানে কিয়ামাত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি তখন বলেন : ‘যে পর্যন্ত দশটি ব্যাপার সংঘটিত না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামাত হবেনা। (১) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। (২) ধূয়া নির্গত হওয়া। (৩) ‘দাব্বাতুল আরয’ বের হওয়া। (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটা। (৫) ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব। (৭) যমীনের তিন জায়গা ধ্বংসে যাওয়া। (৭ক) পূর্বে (৮খ) পশ্চিমে (৯গ) আরাব উপদ্বীপে এবং (১০) আদন হতে একটা আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করবে। ওটা (আগুন) রাতও তাদের সাথে অতিবাহিত করবে। যখন দুপুরের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে তখনও এ আগুন তাদের সঙ্গেই থাকবে।’

ঈসার (আঃ) বর্ণনা

পূর্বেও যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আদম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি তোমরা ঈসাকে (আঃ) দেখতে পাও তাহলে মনে রেখ, তিনি সুঠাম দেহের রক্তিম ও সাদা বর্ণের মিশ্রিত ব্যক্তি। তিনি হালকা হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করে অবতরণ করবেন। মনে হবে যেন তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা বড়ো পরছে, অথচ কোন পানীয় বাষ্প তার গায়ে লাগেনি। (আবু দাউদ ৪/৪৯৮)

অন্য এক হাদীসে নাওয়াস ইব্ন সামআন (রহঃ) বর্ণনা করেছেন : তিনি দামেস্কের সাদা মিনারের কাছে পূর্ব দিকে অবতরণ করবেন। তিনি দুই প্রস্থ জাফরান রংয়ের কাপড় পরিধান করা থাকবেন, তাঁর হাত দু’টি থাকবে মালাইকা/ফেরেশতার দুই পাখার উপর। যখনই তিনি তাঁর মাথা নিচু করবেন

তখন ফোটা ফোটা ঝরতে থাকবে। আবার যখন তিনি মাথা উচু করবেন তখনও উজ্জ্বল বিচ্ছুরিত মুক্তার মত ঝরে পড়তে থাকবে। ঈসার (আঃ) নিঃশ্বাস যে কাফিরের উপর পতিত হবে সে আর বেঁচে থাকবেনা এবং যতদূর দৃষ্টি যাবে ততদূর তার নিঃশ্বাস চলে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৫০)

৭৪১ হিজরী সালে ‘জামে’ উমাইয়া’র স্তম্ভটি সাদা পাথরে ময়বুত করে বানানো হয়েছে। কেননা ওটা আগুনে দক্ষীভূত হয়েছিল। সেই আগুন খৃষ্টানরাই লাগিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা ঐ খৃষ্টানদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। এতে বিস্ময়ের কি আছে যে, এটাই হয়তো সেই স্তম্ভ যার উপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং শূকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন ও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেননা, যেমন হাদীসগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ওগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন ও তাকে সাব্যস্ত করেছেন। এটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে এবং মানুষ যখন ঈসার (আঃ) অনুসরণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মিরাজের রাতে আমি মূসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি মাঝারী গঠন ও পরিষ্কার চুল বিশিষ্ট, যেমন শানূআহ গোত্রের লোক হয়ে থাকে। ঈসার (আঃ) সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। তিনি লাল বর্ণের এবং মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মনে হচ্ছিল যে, যেন তিনি সবেমাত্র গোসলখানা হতে বের হয়ে এলেন। ইবরাহীমকেও (আঃ) আমি দেখেছি। তিনি একেবারে আমার মতই ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, মুসলিম ১/১৫৪)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি ঈসা (আঃ) ও মূসাকে (আঃ) দেখেছি। ঈসা (আঃ) রক্তিম বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল এবং চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। মূসা (আঃ) গোধূম বর্ণ, মোটা দেহ এবং সোজা চুল বিশিষ্ট ছিলেন, যেমন ‘যূত’ গোত্রের লোকেরা হয়ে থাকে।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৯) অনুরূপভাবে তিনি দাজ্জালের শারীরিক গঠনও বর্ণনা করেছেন : আল্লাহর চোখ অন্ধ নয়, কিন্তু মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ, তার চোখ দেখতে ফোলা প্রসারিত আঙ্গুরের মত। (মুসলিম ৪/২২৪৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কা‘বা ঘরের নিকট আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে যে, একজন খুবই রক্তিম বর্ণের লোক, যার মাথার চুল তাঁর দু’কাঁধ পর্যন্ত লটকে ছিল এবং চুল ছিল পরিপাটি। তাঁর মাথা হতে

পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। তিনি দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তখনই আমাকে বলা হল, 'ইনি হচ্ছেন মাসীহ ইব্ন মারইয়াম (আঃ)।' তাঁর পিছনে আমি আর একটি লোককে দেখতে পাই যার ডান চক্ষুটি কানা ছিল। ইব্ন কাতানের সঙ্গে সে অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। সেও দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কে? বলা হল, 'মাসীহ দাজ্জাল।' (মুসলিম ১/১৫৪)

সহীহ বুখারীতে আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে বলেন : 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসাকে (আঃ) লাল বর্ণের বলেননি, বরং গোধূম বর্ণের বলেছেন।' পরে উপরে বর্ণিত পূর্ণ হাদীসটি রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ দাজ্জালের সাথে খুযাআহ গোত্রের ইব্ন কাতানের চেহারার মিল রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যুহরী (রহঃ) বলেন যে, খুযাআহ গোত্রের ইব্ন কাতান অজ্ঞতার যুগে মারা গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا উত্থান দিনে সে তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবে। অর্থাৎ এ কথার তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর রিসালাত তাঁদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদায় বলেন :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ آخُذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ۚ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِنَّ تَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আর যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে : তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে : আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখনতো আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৬-১১৮)

১৬০। আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেকে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত।

۱۶۰. فَبُظْلِمَ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

১৬১। এবং তারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করত এবং তারা অন্যায়ভাবে লোকদের ধন সম্পদ গ্রাস করত এবং আমি তাদের মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্য

۱۶۱. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأُكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

যজ্ঞাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসী তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং যারা সালাত আদায়কারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী তাদেরকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান করব।	<p>١٦٢. لَكِنَّ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا</p>

ইয়াহুদীদের অন্যায় আচরণ ও অবাধ্যতার কারণে কিছু হালাল খাদ্যও তাদের জন্য হারাম করা হয়

অবিচার, ঔদ্ধত্যতা এবং বড় বড় পাপ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা, পূর্বে যা হালাল ছিল এমন কোন কোন খাদ্যকে ইয়াহুদীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ইয়াহুদীরা তাদের কিতাবের ভুল অর্থ করে মানুষের কাছে প্রচার করেছে, পরিবর্তন করেছে এবং তাদের লোকদের জন্য তা বৈধ করেছে। এভাবে ধর্মের ভিতর সংযোজন ও বিয়োজন করে যা হালাল ছিল তা নিজেদের জন্য অবৈধ বা হারাম করেছে। আবার এও হতে পারে যে, পূর্বে যা বৈধ ছিল তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা অবৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ

প্রত্যেক খাদ্যই বানী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। একমাত্র তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈল নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিল তাই তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৩) এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈলের উপর সমস্ত খাদ্যই বৈধ ছিল। কিন্তু ইসরাঈল (আঃ) নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করেছিলেন। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দু'টো জিনিস হারাম করে দেয়া হয়। পরে আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে অনেক কিছু উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمًا عَلَيْهِمْ شَحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا
اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৪৬)

এর অর্থ হল তাদের ঔদ্ধত্যতা, অবিচার, তাদের নাবীর বিরোধীতা এবং তার সাথে মতদ্বৈততার কারণে তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা (৪ : ১৬০) এ আয়াতে বলেন যে, তারা সত্য হতে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখে এবং অন্যদেরকেও আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে। তাদের এই স্বভাব যেমন পূর্বে ছিল এখনও চলে আসছে। তারা পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানেও তারা নাবীগণের শত্রু। তারা অনেক নাবীকে হত্যা করেছে, তারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করেছে।

সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি, নিজে আল্লাহ তা'আলার পথ হতে সরে যাওয়া ও অপরকে সরিয়ে দেয়া, যা তাদের চিরন্তন অভ্যাস ছিল, রাসূলগণকে হত্যা করা, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে সুদ ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন

কতগুলো জিনিস হারাম করেন যেগুলো তাদের জন্য হালাল ছিল। ঐসব কাফিরদের জন্য তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা কুরআন কারীম ও পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। এ বাক্যটির তাফসীর সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সা'লাবা ইব্ন সাঈদ (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাঈদ (রাঃ) এবং উসায়েদ ইব্ন উবায়দকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে স্বীকার করেছিলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তারা যাকাত প্রদান করে থাকে'। অর্থাৎ সম্পদের বা জীবনের যাকাত দিয়ে থাকে। ভাবার্থ দু'টিও হতে পারে। আর তারা একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদাতের যোগ্য মনে করে এবং তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, সেদিন প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। এ প্রকারের লোককেই আমি প্রদান করব মহাপ্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত।

১৬৩। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেসব আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নাবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তৎপরবর্তী নাবীগণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন, সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম।

۱۶۳. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا
أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ
بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ
وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا

<p>১৬৪। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মুসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন।</p>	<p>۱۶۴. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا</p>
<p>১৬৫। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।</p>	<p>۱۶۵. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا</p>

অন্যান্য নাবীগণের মতই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) উপর অহী নাথিল হয়েছে

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন যে, সাকীন ও আদী ইব্ন যায়িদ বলেছিল, ‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা স্বীকার করি না যে, মুসার (আঃ) পরে আল্লাহ তা‘আলা কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেছেন’। তখন এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের দোষগুলো বর্ণনা করেন এবং তাদের পূর্বের ও বর্তমানের জঘন্য কার্যাবলী প্রকাশ করেন।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে প্রত্যাদেশ করেন যেমন প্রত্যাদেশ করেছিলেন তিনি অন্যান্য নাবীগণের উপর। (তাবারী ৯/৪০০) ‘যাবুর’ ঐ আসমানী কিতাবের নাম যা দাউদের (আঃ) উপর নাথিল হয়েছিল। ঐ নাবীগণের ঘটনা আমরা সূরা কাসাসে বর্ণনা করেছি।

কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নাবীর উল্লেখ রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ**

نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসুলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসুল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। অর্থাৎ এ আয়াত নাথিলের পূর্বে পবিত্র কুরআনে বহু নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং অনেক নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়নি। যে নাবীগণের নাম কুরআনুল হাকীমে এসেছে সেগুলি নিম্নরূপ :

আদম (আঃ), ইদরীস (আঃ), নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), লূত (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), আইউব (আঃ), শূ‘আইব (আঃ), মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), ইউনুস (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ), ইলিয়াস (আঃ), ইয়াসাআ (আঃ), যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহুইয়া (আঃ), ঈসা (আঃ) ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে যুলকিফল (আঃ) এবং সর্বশেষ ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মূসার (আঃ) মর্যাদা

এরপর আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন : ‘এবং আল্লাহ প্রত্যক্ষ বাক্যে মূসার সাথে কথা বলেছেন।’ এটা তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা যে, তিনি কালীমুল্লাহ ছিলেন। একটি লোক আবু বাকর ইব্ন আয়াশের (রহঃ) নিকট এসে বলে : ‘একটি লোক এ বাক্যটিকে **وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا** এরূপ পড়ে থাকে। অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।’ (তাবারানী ৩৩২৫) এ কথা শুনে আবু বাকর ইব্ন আয়াশ (রহঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন : ‘কোন কাফির এভাবে পড়ে থাকবে। আমি আ‘মাশ (রহঃ) হতে, তিনি ইয়াহুইয়া (রহঃ) হতে, তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে এবং আলী (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا এরূপই পড়েছেন।’ মোট কথা, ঐ লোকটির অর্থ ও শব্দের পরিবর্তন করে দেয়া দেখে তিনি এরূপ রাগান্বিত হন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটা কোন মুতাযিলাই হবে। কেননা মুতাযিলাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা‘আলা না মূসার (আঃ) সঙ্গে কথা বলেছেন, আর না অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন। কিছু মুতাযিলা কোন একজন মনীষীর নিকট এসে এ আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করলে তিনি তাকে মন্দ বলেন। অতঃপর তাকে বলেন : ওহে ঘৃণ্য নারীর ছেলে! ‘তাহলে তুমি وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ এবং যখন মূসা আমার প্রতিশ্রুত সময়ে আগমন করে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেন’ (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ১৪৩) এ আয়াতটিকে কিভাবে অস্বীকার করবে? ভাবার্থ এই যে, এখানে এ ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন চলবেনা।

সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল

এরপর আল্লাহ সুবহানাহ বলেন : رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ তারা এমন রাসূল যারা আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য স্বীকারকারীদেরকে ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের ও তাঁর রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا আল্লাহ তা‘আলা যে স্বীয় গ্রন্থরাজি অবতীর্ণ করেছেন ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তা এ জন্য যে, যেন কারও কোন ওয়র অবশিষ্ট না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা বলত : হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তা হলে আমরা লাল্হিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (সূরা তা-হা, ২০ : ১৩৪)

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ... (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলার মত মর্যাদা বোধ আর কারও নেই। এ জন্যই তিনি সমস্ত মন্দকে হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক এবং এমনও কেহ নেই যার কাছে প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলা অপেক্ষা বেশি পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন। এমনও কেহ নেই যার নিকট ক্ষমা আল্লাহ তা‘আলা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়। এ জন্যই তিনি নাবীগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪)

১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট।

١٦٦. لَئِنْ كَانَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا
أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ
وَالْمَلَأَتْكِ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا

১৬৭। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করেছে, অবশ্যই তারা সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।

١٦٧. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا

১৬৮। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা

١٦٨. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا

এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেননা-	لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا
১৬৯। জাহান্নামের পথ ব্যতীত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।	<p>١٦٩. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا</p>
১৭০। হে মানববৃন্দ! নিশ্চয়ই তোমাদের রবের সন্নিধান হতে সত্যসহ রাসূল আগমন করেছেন, অতএব বিশ্বাস স্থাপন কর - তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহর এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।	<p>١٧٠. يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُكُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا</p>

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাঁর নাবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এজন্যই এখানে বলা হচ্ছে, ‘হে নাবী! গুটিকতক লোক তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে বটে, لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছেন।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৪২) এর মধ্যে ঐ সমুদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যা তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, ফুরকান, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গুণাবলী, যেগুলি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অবহিত না করা পর্যন্ত কোন রাসূল বা কোন নৈকট্য লাভকারী মালাক/ফেরেশতাও জানতে পারেননা! যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে :

وَلَا تُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা। (সূরা তা-হা, ২০ : ১১০)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ আল্লাহর সাক্ষ্যের সাথে সাথে ফেরেশতাগণেরও সাক্ষ্য রয়েছে যে, যা তোমার নিকট এসেছে এবং যে অহী তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য।

ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বলেন : 'আল্লাহর শপথ! আমার নিশ্চিত রূপে জানা রয়েছে যে, আমার রিসালাতের অবগতি তোমাদের রয়েছে।' ঐ লোকগুলো ঐ কথা অস্বীকার করে। তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত (৪ : ১৬৭) অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : যেসব লোক কুফরী করে সত্যের অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এমনকি অন্য লোকদেরকেও সত্য পথে আসতে বাধা দিয়েছে তারা সঠিক পথ হতে সরে পড়েছে এবং প্রকৃত বিষয় থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তারা সুপথকে হারিয়ে ফেলেছে। এসব লোক, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে, আমার কিতাবকে অমান্য করেছে, আমার পথে আসতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, আমার নিষিদ্ধ কার্যাবলী করতে রয়েছে এবং আমার নির্দেশাবলী অমান্য করেছে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করবনা এবং তাদেরকে সুপথও প্রদর্শন করবনা, বরং তাদেরকে

জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করব। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ

হে লোকসকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তাঁর রাসূল আগমন করেছেন। তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের ঈমান আনায় তাঁর কোন লাভও নেই এবং তোমাদের অস্বীকার করায় তাঁর কোন ক্ষতিও নেই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। এ কথাই মুসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন :

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

মুসা বলেছিল : তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৮) তিনি সারা বিশ্ব হতে অমুখাপেক্ষী; তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই জানেন কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য। তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর কথা, তাঁর কাজ, তাঁর শারীয়াত এবং তাঁর বিধান সবকিছুই নিপুণতাপূর্ণ।

১৭১। হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করনা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলনা; নিশ্চয়ই মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা; অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন

۱۷۱. يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوا فِیْ دِیْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلٌ ۗ اللّٰهُ وَكَلِمَتُهُ

কর। আর ‘আল্লাহ তিন জনের একজন’ এ কথা বলা পরিহার কর। তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র ইলাহ; তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পুতঃ, মুক্ত। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرِيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ
فَأَمِينُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا
تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا
لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ
سُّبْحَانَهُ ۚ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ
لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

আহলে কিতাবদেরকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবকে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করছেন। খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছিল এবং তাঁকে নাবুওয়্যাত হতে বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তারা তাঁর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহকে ইবাদাত করার মত, ঈসার (আঃ) ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, এমনকি অন্যান্য মনীষীর ব্যাপারেও তাদের ধারণা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টান ধর্মের আলেমদেরকেও তারা নিস্পাপ মনে করতে থাকে এবং এ ধারণা করে নেয় যে, ধর্মের আলেমগণ যা কিছু বলেন তা তাদের মেনে নেয়াই অপরিহার্য কর্তব্য। সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং সুপথ-ভ্রান্তির পথ পরীক্ষা করার কোন অধিকার তাদের নেই, যার বর্ণনা কুরআনুল হাকীমে নিম্নের এ আয়াতে রয়েছে :

أَتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৩১)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা আমার ব্যাপারে এমনভাবে বাড়াবাড়ি করনা যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো একজন দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল বলবে।’ (আহমাদ ১/২৩, ফাতহুল বারী ৬/৫৫১)

মুসনাদ আহমাদে অপর একটি হাদীসে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : ‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হে আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে! হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হে লোকসকল! তোমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতি খেয়াল রেখ, শাইতান যেন তোমাদেরকে ফাঁদে না ফেলে। আমি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমি চাইনা যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তদপেক্ষা বেশি বাড়িয়ে বল।’ (আহমাদ ৩/১৫৩) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিওনা। তোমরা তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করনা। তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ওটা হতে তিনি বহু দূরে ও বহু উচ্ছে রয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া কেহ মা‘বুদ ও প্রভু নেই।

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ মাসীহ ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে একজন দাস এবং তাঁর একজন সৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি শুধু ‘হও’ শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন, যে শব্দটি নিয়ে জিবরাইল (আঃ) মারইয়ামের (আঃ) নিকট এনেছিলেন এবং আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ঐ কালেমা তাঁর মধ্যে ফুঁকে দেন। এর ফলেই ঈসার (আঃ) জন্ম হয়। পিতা ছাড়াই একমাত্র এ কালেমার মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টি হন বলেই তাঁকে বিশেষভাবে ‘কালেমাতুল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কুরআন মাজীদে অন্য আয়াতে রয়েছে :

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ
صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ

মাসীহ ইবন মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫৯) কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَاهَا
لِلْعَالَمِينَ

আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল এবং আমি তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিয়েছি এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৯১) আর এক আয়াতে রয়েছে :

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১২) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

সে (ঈসা আঃ) তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৯) সুতরাং ভাবার্থ এ নয় যে, স্বয়ং আল্লাহর কালেমাই ঈসা (আঃ) হয়ে গেছেন। বরং ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার কালেমার মাধ্যমে ঈসার (আঃ) জন্ম হয়েছে।

তিনি তাঁর ‘কালেমা’ এবং ‘রুহ’ এর অর্থ

আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা‘মার (রহঃ) হতে বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন
 مِنْهُ وَأَيُّهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (আল্লাহ)
 বলেছিলেন ‘হও’, ফলে তিনি (ঈসা) হয়ে যান। (আবদুর রায্যাক ১/১৭৭)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান আল ওয়াসিতী (রহঃ)
 বলেন যে, তিনি শা‘দ ইব্ন ইয়াহইয়াকে (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে
 শুনেছেন : ঈসা (আঃ) কোন শব্দ নয়, বরং ঈসার (আঃ) জন্ম হয় একটি শব্দের
 মাধ্যমে। (ইব্ন আবী হাতিম ৬৩১০)

সহীহ বুখারীতে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ
 এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর
 বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা
 তিনি মারইয়ামের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্ট রুহ। আরও সাক্ষ্য
 দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা‘ই হোক না কেন আল্লাহ
 তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’ (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৭) অন্য বর্ণনায়
 এতটুকু বেশি রয়েছে যে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যেটি দিয়ে ইচ্ছা
 প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/৫৭) ঈসাকে (আঃ) যেমন কুরআন ও হাদীসে رُوح

مِنْهُ বলা হয়েছে ঐ রকমই কুরআনুল হাকীমের একটি আয়াতে রয়েছে :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব
 কিছু নিজ অনুগ্রহে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৩) অর্থাৎ স্বীয় মাখলুক হতে। رُوح
 مِنْهُ এর ভাবার্থ এটাই। এর অর্থ হল ‘তাঁর’ সৃষ্টি হতে। ‘তাঁর হতে’ এর অর্থ এই
 নয় যে এটি তাঁর অংশ, যা খৃষ্টানরা দাবী করে থাকে। তাদের এ দাবীর জন্য
 আল্লাহ তা‘আলার অভিশাপ বর্ষণ হতে থাকুক। সুতরাং এখানে مِنْ শব্দটি
 تَبْعِيض এর জন্য অর্থাৎ কতককে বুঝানোর জন্য নয়, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানদের
 ধারণা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর একটা অংশ ছিলেন। বরং مِنْ এখানে

إِبْتِدَاء অর্থাৎ প্রারম্ভের জন্য এসেছে। মুজাহিদ বলেন যে, رُوحٌ مِنْهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে رَسُولٌ مِنْهُ অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে রাসূল।

সুতরাং তাঁকে ‘রুহুল্লাহ’ বলা ঐরূপই যেরূপ বলা হয় ‘নাকাতুল্লাহ’ (আল্লাহর উদ্ভী) এবং ‘বাইতুল্লাহ’ (আল্লাহর ঘর)। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই নিজের দিকে সম্বন্ধ লাগিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ তোমরা এ বিশ্বাস করে নাও যে, আল্লাহ এক, তিনি স্ত্রী ও সন্তান হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং এটাও বিশ্বাস করে নাও যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস, তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল। وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً তোমরা ‘তিন’ বলা। অর্থাৎ ঈসা (আঃ) ও মারইয়ামকে (আঃ) আল্লাহর সাথে অংশীদার করনা। কেহ আল্লাহর অংশীদার হবে এ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। সূরা মায়িদাহয় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কান্নাফির যারা বলে : ‘আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা‘বুদের) এক’, অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭৩) যেমন আল্লাহ তা‘আলা সূরা মায়িদাহর শেষে বলেন :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

আর যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইবন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে : তোমরা আল্লাহর সাথে আমারও ইবাদাত কর? (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৬) সূরার প্রথমেও বলা হয়েছে :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

নিশ্চয়ই তারা কান্নাফির যারা বলে : নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মাসীহ (ঈসা) ইবন মারইয়াম! (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১৭)

ঈসা (আঃ) ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবেন। খৃষ্টানদের নিকট এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। অযথা তারা ভ্রান্তির পথে চালিত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তো ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহ তা‘আলার শরীক মনে করছে। আবার কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহ তা‘আলার পুত্র বলছে। তাদের বিশ্বাস

এবং মতবাদ নানাবিধ এবং তা একটি অপরটির বিপরীত। তাই বলা হয়ে থাকে যে, কোথাও যদি ১০ জন খৃষ্টান একত্রিত হয় তাহলে সেখান থেকে ১১টি মতবাদ প্রকাশ পাবে।

খৃষ্টানদের বিভিন্ন মতভিন্নতা

সাদ্দ ইব্ন বাতরীক ইসকানদারী নামক খৃষ্টানদের একজন বড় পণ্ডিত প্রায় চারশ হিজরীতে বর্ণনা করেছে যে, কনসটান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কনস্টানটাইনের শাসনামলে সেই যুগীয় বাদশাহর নির্দেশক্রমে খৃষ্টানদের এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে যে সমস্ত খৃষ্টান যোগদান করে তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে চুক্তিকে তারা মহান চুক্তি বলে অভিহিত করে। আসলে তাকে বলা যেতে পারে ‘মহা প্রতারনা।’ সেখানে তাদের দু’হাজারেরও বেশি বড় বড় পাদরী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশি মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যে, কোন বিষয়ের উপর সত্তর আশি জনের বেশি লোক একমত হতে পারেনি। দশজনের এক রকম বিশ্বাস, বিশজনের আর এক খেয়াল, চল্লিশজন অন্য কিছু বলে এবং ষাট জন অন্য দিকে যায়।

মোট কথা, হাজার হাজার লোকের মধ্যে অতিকষ্টে মাত্র তিনশ’ এর কিছু বেশি লোক এক সিদ্ধান্তে একমত হয়। বাদশাহ ঐ আকীদাকেই গ্রহণ করে এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করে। কনস্টানটাইন নিজে একজন দামলিক ছিল। সে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদের জন্য গীর্জা বানিয়ে দেয়, গ্রন্থরাজি লিখিয়ে দেয় ও আইন কানুন লিপিবদ্ধ করে। ওরাই আমানাত-ই-কুবরার মাসআলা বের করে যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম খেয়ানাতই ছিল। ঐ লোকগুলোকে ‘সম্পদেকানিয়্যাহ’ বলা হয়। দ্বিতীয় বার সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয়, তার নাম হচ্ছে ‘ইয়াকুবিয়্যাহ।’ অতঃপর তৃতীয় সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয় তার নাম ‘নাসতুরিয়্যাহ।’ এ তিনটি দল ঈসার (আঃ) ব্যাপারে তিনটি উক্তি করে থাকে। (অর্থাৎ একদল তাঁকেই আল্লাহ বলে, একদল তাঁকে আল্লাহর অংশীদার বলে এবং একদল তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে)। তারা আবার একে অপরকে কাফির বলে থাকে। আর আমাদের নিকট তো তারা সবাই কাফির। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

اِنَّهُمْ اَوْ خَيْرًا لَّكُمْ

তোমরা এটা হতে বিরত হও এবং এ বিরত থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহ তো এক, সন্তান হওয়া হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্তই তাঁর সৃষ্ট এবং সমস্ত কিছুই তাঁর অধিকারে রয়েছে।

সকলেই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তাহলে তাঁরই মাখলূকের মধ্যে কেহ তাঁর স্ত্রী এবং কেহ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? (সূরা আন'আম, ৬ : ১০১) সূরা মারইয়ামেও বিস্তারিতভাবে এর অস্বীকৃতি রয়েছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا

তারা বলে : দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছে। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৮-৯৫)

১৭২। আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে মাসীহ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত মালাইকা/ফেরেশতাদের কোনই সংকোচ নেই; এবং যারা তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে তিনি

۱۷۲. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ

তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।	<p>عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسِيحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا</p>
<p>১৭৩। অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে তিনি সম্যক প্রতিদান প্রদান করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর দান করবেন এবং যারা সংকুচিত হয় অহংকার করে, তাদেরকে তিনি যজ্ঞদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবেনা।</p>	<p>۱۷۳. فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا</p>

রাসূল (সাঃ) এবং মালাইকা

আল্লাহর ইবাদাত করতে লজ্জাবোধ করেননা

ভাবার্থ এই যে, মাসীহ (আঃ) এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত মালাইকা /ফেরেশতাগণও আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে মোটেই সংকোচবোধ করেননা এবং অহংকারও করেননা। (তাবারী ৯/৪২৪) এটা তাদের জন্য শোভনীয়ও নয়। বরং যারা যত বেশি আল্লাহ তা'আলার নৈকট লাভ করেন তাঁরা ততো বেশি পরিমাণ তাঁর ইবাদাত করে থাকেন।

وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং অহংকার করছে তারা একদিন তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সেদিন তাদের ব্যাপারে

যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা তারা নিজেরাই শুনে নিবে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় করুণা দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও আনুগত্য হতে সরে পড়ে এবং অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না'। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'কিন্তু যারা অহংকার করে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্চিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬০) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও অহংকারের প্রতিদান এই দেয়া হবে যে, তারা ঘৃণ্য, লাঞ্চিত ও অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭৪। হে লোক সকল! তোমাদের রবের সন্নিধান হতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।

১৭৪. يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

১৭৫। অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে সুদৃঢ় রূপে ধারণ করেছে, ফলতঃ তিনি তাদেরকে স্বীয় করুণা ও কল্যাণের দিকে প্রবৃষ্ট করাবেন এবং স্বীয় সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

১৭৫. فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَهَدَّيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا

আল্লাহর কাছ থেকে অহী অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন : আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট পূর্ণ দলীল, ওয়র, আপত্তি ও সন্দেহ দূরকারী প্রমাণাদি অবতীর্ণ করা হয়েছে। وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট জ্যোতি (কুরআন কারীম) অবতীর্ণ করেছি, যার দ্বারা সত্যের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ইবন জুরায়েজ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪২৮) এখন যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনবে, তাঁর উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল হবে, তাঁকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তাঁরই দাসত্ব করবে, সমস্ত কাজ তাঁকেই সমর্পণ করবে এবং এও হতে পারে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কিতাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে তাদের উপর তিনি স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাদের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং তাদেরকে এমন সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন যাতে না থাকবে কোন বক্রতা, আর না কোন জায়গা সংকীর্ণ হবে। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তি পৃথিবীতে সরল ও সোজা পথের উপর এবং ইসলামের পথে থাকে। আর পরকালে থাকে জান্নাতের পথে ও শান্তির পথে।

১৭৬। তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল : আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার ভগ্নী থাকে তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তাহলে তার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি

۱۷۶. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُهُأ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُدَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِنَّ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا ائْتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ

দুই ভগ্নী থাকে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা ভগ্নী-পুরুষ ও নারীগণ থাকে তাহলে পুরুষ দুই নারীর তুল্য অংশ পাবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও, এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

‘কালানাহ’ সম্পর্কিত এ আয়াতটিই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত

বারা’ (রাঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয় সূরা বারা’আত এবং আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয় **يَسْتَفْتُونَكَ** এ আয়াতটি। (ফাতহুল বারী ৮/১১৭) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : ‘আমি রোগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তিনি উষু করে সেই পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন, ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো ‘কালানাহ’। আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বন্টিত হবে? সে সময় আল্লাহ তা‘আলা ফারাসেয়ের আয়াত অবতীর্ণ করেন।’ (আহমাদ ৩/২৯৮, ফাতহুল বারী ১২/২৬, মুসলিম ৩/১২৩৫)

অন্য বর্ণনায়ও এ আয়াতটিই অবতীর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/৫, মুসলিম ৩/১২৩৫, আবু দাউদ ৩/৩০৮, তিরমিযী ৬/২৭৩, নাসাঈ ৪/৫৯, ইব্ন মাজাহ ১/৪৬২)

প্রথমে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ‘কালানাহ’ শব্দটি **إِكْلِيل** শব্দ হতে নেয়া হয়েছে যা চতুর্দিক হতে মাথাকে ঘিরে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে ‘কালানাহ’ ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় যার সন্তান কিংবা মা-বাবা না থাকে। আবার

কারও কারও উক্তি এও আছে যে, যার সন্তান না থাকে। যেমন এ আয়াতে রয়েছে : **لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ**

উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সামনে যেসব জটিল প্রশ্ন এসেছিল তন্মধ্যে এটিও ছিল একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন : ‘তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার এ আকাংখা রয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ সব ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন কিছু বর্ণনা করতেন তাহলে আমরা ঐ সিদ্ধান্ত মেনে চলতাম। ঐগুলি হচ্ছে রেখে যাওয়া সম্পদে দাদার উত্তরাধিকার, কালালাহ এবং সুদের অধ্যায়সমূহ। (ফাতহুল বারী ১/৪৮, মুসলিম ৪/২৩২২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘কালালাহ’ সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করেছি অন্য কোন মাসআলা সম্বন্ধে ততো প্রশ্ন করিনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বক্ষে স্থায়ী আঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করে আমাকে বলেন : ‘তোমার জন্য গ্রীষ্মকালের আয়াতটিই যথেষ্ট যা সূরা নিসার শেষে রয়েছে।’ (আহমাদ ১/২৬) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/১২৩৬)

৪ : ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে **هَلَكَ** শব্দের অর্থ হচ্ছে **مَاتَ** অর্থাৎ মরে গেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ২৬-২৭)

এরপর বলা হচ্ছে ‘তার সন্তান নেই’। এর দ্বারা কেহ কেহ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ‘কালালাহর’ শর্তে পিতা না হওয়া নেই বরং যার সন্তান নেই সে‘ই ‘কালালাহ’। তাফসীর ইব্ন জারীরে উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে।

কিন্তু বিজ্ঞজনদের উক্তিই হচ্ছে সঠিক এবং আবু বাকর সিদ্দিকীরও (রাঃ) সিদ্ধান্ত এটাই যে, ‘কালাহ’ হচ্ছে ঐ মৃত ব্যক্তি যার সন্তান কিংবা পিতা জীবিত নেই এবং আয়াতের পরবর্তী শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ যদি তার বোন থাকে তাহলে তার জন্য

সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধাংশ। আর যদি বোনের সঙ্গে পিতা থাকে তাহলে পিতা তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দিবে। সবারই মত এই যে, ঐ অবস্থায় বোন কিছুই পাবে না।

তাহসীনের ইবন জারীরে ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি মেয়ে ও একটি বোন রেখে মারা যায় তার ব্যাপারে তাদের উভয়েরই ফাতওয়া ছিল এই যে, ঐ অবস্থায় বোন বঞ্চিত হবে, সে কিছুই পাবে না। কেননা কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতে বোনের অর্ধাংশ পাওয়ার অবস্থা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে। আর এখানে সন্তান রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন যে, ঐ অবস্থায়ই (৪ : ১৭৬) এ আয়াতের মাধ্যমে নির্ধারিত অংশ হিসাবে মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং ‘আসাবা’ হিসাবে বোনও অর্ধেক পাবে।

সুলাইমান বলেন যে, ইবরাহীম (রহঃ) আল আসওয়াদকে (রহঃ) বলেন : আমাদের মধ্যে মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ ফাইসালা করেন যে, অর্ধেক মেয়ে পাবে ও অর্ধেক বোন পাবে। (বুখারী ৬৭৪১) সহীহ বুখারীর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবু মূসা আশআরী (রাঃ) মেয়ে, পৌত্রী ও বোনের ব্যাপারে মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক দেয়ার ফাতওয়া দেন। অতঃপর বলেন : ‘ইবন মাসউদকেও (রাঃ) একটু জিজ্ঞেস করে এসো, সম্ভবতঃ তিনি আমার মতই ফাতওয়া দিবেন।’ কিন্তু যখন ইবন মাসউদকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় এবং সাথে সাথে আবু মূসা আশআরীর (রাঃ) ফাতওয়াও তাঁকে শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তিনি বলেন : ‘তাহলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে আমি গণ্য হব না। জেনে রেখ, এ ব্যাপারে আমি ঐ ফাইসালাই করব যে ফাইসালা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। অর্ধেক দাও মেয়েকে, এক ষষ্ঠাংশ দাও পৌত্রীকে, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে গেল এবং যা অবশিষ্ট থাকল তা বোনকে দিয়ে দাও।’ আমরা ফিরে এসে আবু মূসা আশআরীকে (রাঃ) এ সংবাদ দিলে তিনি বলেন : ‘যে পর্যন্ত

এ জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন সে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট এ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসোনা ।’ (বুখারী ৬৭৩৬) অতঃপর বলা হচ্ছে :

فَإِنْ كَانَتْ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ উত্তরাধিকারী হবে যদি সে ‘কালাহ’ হয় অর্থাৎ যদি তার সন্তান ও পিতা না থাকে। কেননা পিতার বর্তমানে ভাই কোন অংশ পাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি ভাইয়ের সাথে আরও কোন নির্দিষ্ট অংশবিশিষ্ট উত্তরাধিকারী থাকে, যেমন স্বামী বা বৈপিত্রের ভাই, তাহলে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকারী ভাই হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা ফারায়েষকে ওর প্রাপকের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ঐ পুরুষলোকের জন্য যে বেশি নিকটবর্তী।’ (ফাতহুল বারী ১২/১৭, মুসলিম ৩/১২৩৩)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘বোন যদি দু’টি হয় তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।’ দুইয়ের বেশি বোনেরও একই হুকুম। এখান হতেই একটি দল দুই মেয়ের হুকুম গ্রহণ করেছেন। যেমন দু’য়ের বেশি বোনের হুকুম দু’টি মেয়ের হুকুম হতে নিয়েছেন যে আয়াতের শব্দগুলি নিম্নরূপ :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১১) অতঃপর বলা হচ্ছে :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ যদি ভাই ও বোন উভয়েই থাকে তাহলে প্রত্যেক পুরুষের অংশ দু’জন নারীর সমান। ‘আসাবা’রও এ হুকুমই। তারা ছেলেই হোক বা পৌত্রই হোক অথবা ভাই হোক যখন তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই থাকবে তখন দু’জন নারী যা পাবে একজন পুরুষও তাই পাবে। আল্লাহ স্বীয় ফারায়েষ বর্ণনা করছেন, স্বীয় সীমা নির্ধারণ করছেন এবং স্বীয় শারীয়াত প্রকাশ করছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।’ আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত কাজের পরিণাম অবগত রয়েছেন, বান্দাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। প্রাপকের প্রাপ্য কি তা তিনি খুব ভালই জানেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) বলেছেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) একদা সাহাবীগণকে একত্রিত করেন এবং বলেন : আজ আমি ‘কালাহ’ সম্পর্কে এমন একটি সিদ্ধান্ত দিব যা নারীরাও তাদের শয্যাগৃহে বসে আলোচনা করবে। ঐ সময়েই ঘর হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে এবং সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক চলে যায়। তখন উমার (রাঃ) বলেন : ‘মহা সম্মানিত আল্লাহর যদি এ কাজ পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করে দিতেন।’ (তাবারী ৯/৪৩৯) এর ইসনাদ সহীহ।

মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন : ‘যদি আমি তিনটি জিজ্ঞাস্য বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নিতাম তাহলে তা আমার নিকট লালবর্ণের উট পাওয়া অপেক্ষাও পছন্দনীয় হত। প্রথম হচ্ছে এই যে, তাঁর পরে খলীফা কে হবেন? দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, যেসব লোক যাকাতকে স্বীকার করে বটে কিন্তু বলে : আমরা আপনার নিকট তা আদায় করবনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হালাল কি না? তৃতীয় হচ্ছে ‘কালাহ’ সম্বন্ধে।’ ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, দুই শায়খের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) শর্তে এর বর্ণনাধারা সঠিক, তবে একে তারা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। (হাকিম ২/৩০৪)

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন : ‘এ ব্যাপারে আমি আবু বাকরের (রাঃ) বিরোধিতা করায় লজ্জাবোধ করছি।’

আবু বাকর (রাঃ)-এর উক্তি ছিল : ‘কালাহ’ ঐ ব্যক্তি যার পিতা ও পুত্র (জীবিত) না থাকে। (তাবারী ৯/৪৩৭) এ বিষয়ে একমত রয়েছেন বিজ্ঞ সাহাবা (রাঃ), তাবঈঈন এবং আইস্মায়ে দীন। ইমাম চতুর্থ ও সপ্ত ধর্মশাস্ত্রবিদেরও এটাই অভিমত। পবিত্র কুরআনেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন : আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ তা‘আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।’ আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ‘নিসা’র তাফসীর সমাপ্ত।